- ব্ল্যাকহোলের ছবি
- বুয়েট থেকে বিশ্বজয়
- বাংলাদেশে মানমন্দিরের ভবিষ্যৎ
- ডাটা সায়েন্স ও বাংলাদেশ
- গোলকধাঁধার সমাধান করল কোষ
- ব্যাকটেরিয়া ও ইস্টের কথোপকথন

কল্পনার বিজ্ঞান

ট্যাকিয়ন

জুলাই, ২০২২

স্ট্যান্ডার্ড মডেলের ভবিষ্যৎ

কল্পনার বিজ্ঞান

ট্যাকিয়ন

জুলাই ২০২২ সংখ্যা

ভেতরে যা যা আছে

•••

আমাদের কিছু কথা ... ৩

গোলকধাঁধা সমাধান করল কোষ ... ৪

কিউআর কোডের চৌদ্দগুষ্টি ... ৫

ভয়ংকর স্যাটেলাইট ... ৭

ব্ল্যাকহোলের ছবি ... ১০

হকিং রেডিয়েশন করে ব্ল্যাকহোলের মৃত্যু ... ১৩

বুয়েট থেকে বিশ্বজয় ... ১৬

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার নতুন আবিষ্কার! ... ১৮

বাংলাদেশে জ্যোতির্বিজ্ঞান মানমন্দিরের ভবিষ্যৎ ... ২০

সবচেয়ে বড়ো গাছ ... ২৫

সূর্য ছুঁয়েছে পার্কার? ... ২৬

স্ট্যান্ডার্ড মডেলের ভবিষ্যৎ ... ২৮

গাণিতিক রিলেশনশিপ ... ৩৩

ডেটা সায়েন্স ও বাংলাদেশ ... ৩৫

ব্যাকটেরিয়া ও ইস্টের কথোপকথন ... ৩৮

ট্যাকিয়ন

কল্পনার বিজ্ঞান

জুলাই ২০২২ সংখ্যা

ম্যাগাজিন-যোদ্ধারা

কে. এম. শরীয়াত উল্লাহ

রওনক শাহরিয়ার

নাবিল মাহমুদ

শাহরিয়ার আহমেদ সিয়াম

আশরাফ উজ-জামান

আমাদের কিছু কথা

বিজ্ঞানের প্রচার ও চর্চার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ট্যাকিয়ন। ট্যাকিয়ন নামক এক কাল্পনিক কণার গতি আলোর গতির থেকেও বেশি। আমাদের কাছে অসম্ভব কল্পনা বলে কিছু নেই। আমরা সবধরণের বিষয় নিয়েই ভাবতে পছন্দ করি। গত কয়েকমাস আগে আমাদের কণা পদার্থবিজ্ঞানের জগতে এরকমই অসম্ভব একটি ঘটনা সম্ভব হয়ে গিয়েছে। এর কারণে পুরো কণা পদার্থবিজ্ঞানের বিষয়গুলোকে নতুনভাবে লেখার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিতে পারে। সেই গল্পটি নিয়েই আমাদের ম্যাগাজিনের ফিচার আর্টিকেল। এছাড়াও থাকছে জ্যোতির্বিজ্ঞান, গণিত, নিউরোলজি, টেকনোলজি, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা-এর উপর নানা সাম্প্রতিক সময়ের আলোচনা। এবারের সংখ্যায় কিছু কিছু বিষয়ে আমরা বিশেষজ্ঞদের মত হিসেবেও কিছু লেখা যুক্ত করে দিয়েছি এই সাময়িকীতে। এসব লেখার মাধ্যমে আমরা আশা করি বিজ্ঞানের জগতের সাম্প্রতিক একটি চিত্র আমরা সবার সামনে তুলে ধরতে সক্ষম হবো। আর এভাবেই ট্যাকিয়ন তার বিজ্ঞান প্রচার ও চর্চার উদ্দেশ্য নিয়ে এগিয়ে যাবে।

- সম্পাদকমণ্ডলী

আমাদের সাথে যুক্ত হতে

আমাদের ওয়েবসাইট: https://tachyonts.com

আমাদের ফেইসবুক পেইজ: www.facebook.com/TachyonTs

আমাদের ফেইসবুক গ্রুপ: www.facebook.com/groups/tachyonts

আমাদের ইউটিউব চ্যানেল: https://youtube.com/c/tachyonts

আমাদের ই-মেইল: editortachyon@gmail.com

গোলকধাঁধা সমাধান করল কোষ

ইংল্যান্ডের লন্ডনে হ্যাম্পটন কোর্ট প্যালেস নামে একটা রাজপ্রাসাদ আছে। এর উঠানে নিচের চিত্রের মতো দেখতে একটি গোলকধাঁধা আছে। এই গোলকধাঁধার ঠিক মাঝে দুইটি গাছ আছে। আপনাকে প্রবেশপথ দিয়ে প্রবেশ করে এই দুইটি গাছের কাছে পৌঁছাতে হবে। কিন্তু কোন পথে গেলে আপনি গাছগুলোর কাছে পৌঁছাতে পারবেন? এই গোলকধাঁধার সমাধান করুন।

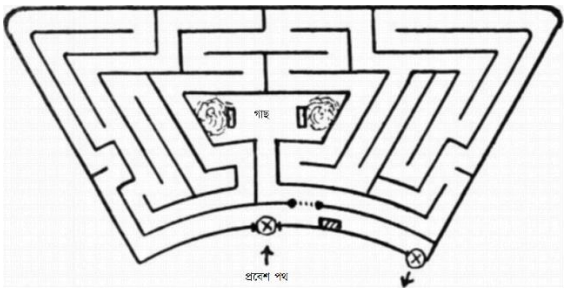

কেমোট্যাক্সিস নামে এক পদ্ধতিতে এক টিস্যু থেকে আরেক টিস্যুতে কিছু কোষ যাতায়াত করতে পারে। যখন কোনো ভাইরাস বা ব্যকটেরিয়া মানবদেহে আক্রমণ করে তখন রক্তের নিউট্রোফিল কোষগুলো দ্রুততম সময়ের মধ্যে সেই আক্রান্ত স্থানে পৌঁছানোর চেষ্টা করে। বিজ্ঞানীরা একটি গোলকধাঁধা তৈরি করলেন ও তার একপাশে কিছু এমন কোষকে ছেড়ে দিলেন যারা কেমোট্যাক্সিসের সাহায্যে অপর পাশ দিয়ে বের হবে। এই সকল পথের মধ্যে কোন পথটি সবচেয়ে দ্রুততম সময়ের মধ্যে বের হওয়ার রাস্তা, তা কোষগুলো খুঁজে বের করতে পারে কি না এটাই যাচাই করতে চাচ্ছিলেন বিজ্ঞানীরা। অবশেষে তারা এর ফলাফল হিসেবে বিষয়টা দেখতে সক্ষমও হলেন।

তারা গোলকধাঁধায় কেমোট্যাক্সিস ঘটাতে সক্ষম এমন কিছু আকর্ষক রাসায়নিক দিয়ে দিয়েছিলেন। তারপর গোলকধাঁধার এক প্রান্তে কিছু অ্যামিবা কোষ ছেড়ে দিয়েছিলেন। সেল্‌ফ জেনারেটেড কেমোট্যাক্সিস প্রসেসের মাধ্যমে অ্যামিবারা গোলকধাঁধার প্রবেশ মুখ দিয়ে প্রবেশ করে ও দ্রুততম সময়ের মধ্যে বাহির হওয়ার মুখ দিয়ে গোলকধাঁধা জয় করে বেরিয়ে যায়।

অ্যামিবা কোষেরা গোলকধাঁধার একপাশ দিয়ে প্রবেশ করে অপর পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে।

তথ্যসূত্র:

Tweedy, L., Thomason, P. A., Paschke, P. I., Martin, K., Machesky, L. M., Zagnoni, M., & Insall, R. H. (2020). Seeing around corners: Cells solve mazes and respond at a distance using attractant breakdown. Science, 369(6507), eaay9792.

কিউআর কোডের চৌদ্দগুষ্টি

নুসরাত জাহান,
শিক্ষার্থী, কুমিল্লা মর্ডান হাই স্কুল।

আমরা সবাই কম বেশি QR Code (কিউআর কোড) দেখেছি। না দেখলেও সমস্যা নেই। নিচে কিউআর কোড এর একটি ছবি দেওয়া আছে। QR হলো কতগুলো সাংকেতিক চিহ্নের মাধ্যমে প্রকাশ করা (Encoded) তথ্যের সমাহার বা প্যাকেট। কিউআর কোড এর পূর্ণরুপ হলো Quick Response Code। এটি একমাত্রিক বার কোডের উন্নত এবং দ্বিমাত্রিক রুপ।

কিউআর কোড এ বিভিন্ন তথ্য অল্প যায়গার মধ্যে কম খরচে বা বিনা খরচে এনকোড করে রাখা যায়। আর কিউআর কোডের মাধ্যমে অল্প সময়ে নির্দিষ্ট তথ্য খুঁজে পাওয়া যায় খুব সহজেই।

আমাদের ফেইসবুক গ্রুপে যুক্ত হতে উপরের কিউআর কোডটি স্ক্যান করুন।

মোর্স কোড কোনো ভাষার বর্ণকে কোডে রুপান্তরের এক ধরনের পদ্ধতি যা দিয়ে এক ধরনের ছন্দের মাধ্যমে টেলিযোগাযোগ করা হয়। মোর্স কোড স্যামুয়েল মোর্স-এর নামে নামকরণ করা হয়েছে। স্যামুয়েল মোর্স ১৮৪০ সালে বৈদ্যুতিক টেলিগ্রাফ যোগাযোগের জন্য প্রথম এ কোড তৈরি করেন।

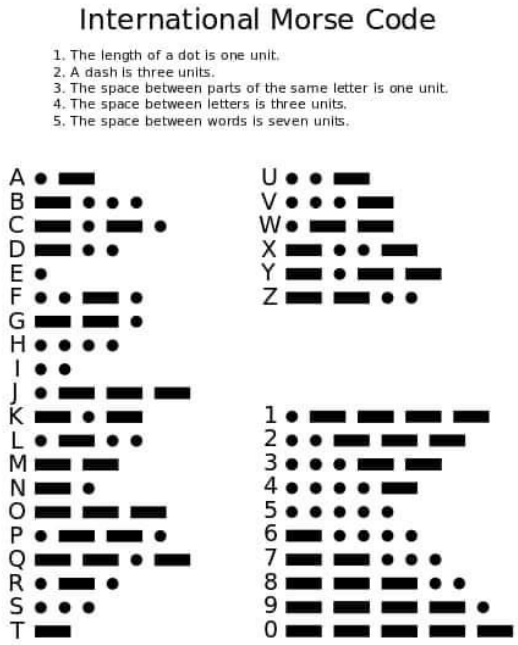

মোর্স কোডের উপর ভিত্তি করে বিজ্ঞানি নরম্যান জোসেফ এবং বার্নাড সিলভার বার কোড আবিষ্কার করেন। বার কোড আমরা সবাই কখনো না কখনো দেখেছি। চিপ্স কিংবা চকলেটের প্যাকেট বা খাতার পিছনের দিকে সারিবদ্ধ কালো লম্বা লম্বা দাগগুলাই বারকোড। বারকোড ব্যবহার করেও অনেক তথ্য এরূপ সংকেতে এনকোড করে রাখা যায়। তবে বারকোডের চেয়ে কিউআর কোডের সুবিধা অনেক বেশি। বারকোড ব্যবহার করা হতো প্রোডাক্টের আইডেন্টিটি নাম্বার প্রকাশ করার জন্য। বারকোডে অল্প সংখ্যক নাম্বার ও হাতেগোনা কিছু ক্যারেকটর ইউজ করা যায় আর কিউআর কোড এ ৪ হাজারের বেশি ইনকোড ক্যারেক্টার সাপোর্ট করে। ১৯৯৪ সালে জাপানের বিখ্যাত অটোমোবাইল কম্পানির অধিনস্ত কম্পানি (Denso wave) থেকে মাসাহিরো হারা

(Masahiro Hara) কিউআর কোড আবিষ্কার করেন। তখন কিউআর কোড এ সংকেতাক্ষরে লেখা কোনো তথ্য নির্দিষ্ট করে চারটি নমুনার উপর ভিত্তি করে তৈরী করা হয়েছিল। সংখ্যা সূচক, বর্ণ সূচক, বাইনারি এবং কান্দজি (এক ধরনের জাপানি লিপিবিদ্যা)।

কিউআর মূলত দ্বিতীয় প্রজন্মের বারকোড, যা দ্রুত বিশ্বজুড়ে জনপ্রিয়তা লাভ করে। কালো-সাদার বর্গক্ষেত্র প্রতিষ্ঠানসমূহ তাদের পণ্যে যুক্ত করতে থাকে ব্যবসায়িক সুবিধার্থে। সেখানে ওয়েবসাইট লিংক, পণ্যের তথ্য, প্রাইজ ট্যাগ দেওয়া থাকে।

এছাড়াও কিউআর কোড রয়েছে নানাবিধ ব্যবহার। কিউআর কোড স্ক্যান করে ওয়াইফাই শেয়ারিং, বিজনেস কার্ড শেয়ারিং, ব্যক্তিগত বিভিন্ন তথ্য আদানপ্রদান, বিভিন্ন ওয়েবসাইটের লিংক শেয়ার, পার্সেল ট্রাকিং, টিকেট সিস্টেম, গুগল অথেটিকেটরের মতো ভেরিফিকেশন, পেমেন্ট সিস্টেমসহ আরও বহু কাজ করা যায়।

তারপর ক্লায়েন্ট খুব সহজেই সেই কোড স্ক্যান করে সরাসরি নির্ধারিত সাইটে প্রবেশ করতে পারবে বা এনকোডেড টেক্সট বা ইরনফরমেশন দেখতে পারবে। কিউআর কোড দুই ধরনের হয়ে থাকে। যথা:

১. স্ট্যাটিক কিউআর কোড।
২. ডায়নামিক কিউআর কোড।

স্ট্যাটিক কিউ আর কোড পরিবর্তন করা যায় না। এখানে নির্দিষ্ট তথ্য এনকোড করা থাকে যা পরবর্তিতে পরিবর্তন করা যায় না।
ডায়নামিক কিউ আর কোডের ভিতরের তথ্য যখন খুশি পরিবর্তন করা যায়। যেমন ধরুন আপনি আপনার একটি বিজনেস কিউ আর কোডে একটি নির্দিষ্ট প্রোডাক্ট এর দাম লিখেছেন ১৩০০০ টাকা। পরবর্তিতে প্রোডাক্ট এর দাম বাড়াতে চাইলে খুব সহজেই সেই টেক্সট চেঞ্জ করে দিতে পারবেন। ডায়নামিক কিউ আর এর সকল তথ্য একটি সার্ভারে সংরক্ষিত থাকে যেখান থেকে এডমিন যখন খুশি টেক্সট চেঞ্জ করার সুবিধা পাবেন। তারপর ক্লায়েন্ট পুর্বের কিউ আর কোড স্ক্যান করলেও পরিবর্তিত তথ্য দেখতে পারবে। ডাইনামিক কিউ আর কোড স্ক্যান করার জন্য অবশ্যই ইন্টারনেট কানেকশান থাকতে হবে। সাধারণত রিডেবল স্ক্যানার দিয়ে কিউআর কোড বা বারকোড স্ক্যান করা যায়। তবে স্মার্টফোনের ক্ষেত্রে বর্তমান সকল ডিভাইস বিল্ড-ইন এই সুবিধা রয়েছে।

ফোন কিছুটা পুরাতন হলে প্লেস্টোর/অ্যাপস স্টোর থেকে থার্ড পার্টি অ্যাপস নামিয়ে নিলেই স্ক্যান করা সম্ভব হবে।

অবিশ্বাস্য হলেও সত্য যে কিউআর কোড তৈরি করা খুবই সহজ। গুগল করলেই শত শত ওয়েবসাইট পাওয়া যাবে কিউআর কোড তৈরি করার। সেখান থেকে খুব সহজেই আপনি যে-কোনো ধরনের কিউ আর কোড তৈরি করে নিতে পারবেন।
এমন একটি সাইট- https://www.the-qrcode-generator.com/

ভয়ংকর স্যাটেলাইট

মো. ইফতেখার হোসেন সীমান্ত, শিক্ষার্থী,
ইলেকট্রিক্যাল এন্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং
বিভাগ, ব্র্যাক ইউনিভার্সিটি

ক্রায়োস্যাট-২ স্যাটেলাইট পৃথিবী পৃষ্ঠ হতে ৭০০ কিলোমিটার উপরে নিজ অক্ষে আবর্তন করছিল। ঠিক সেই সময় মহাকাশে ছড়িয়ে থাকা অন্য স্যাটেলাইটের ধ্বংসাবশেষ এসে সংঘর্ষে লিপ্ত হবে হবে এমন পরিস্থিতি। সংঘর্ষের আগেই ২রা জুলাই European Space Agency (ESA) এই খবর জানতে পারেন। আর ৯ জুলাই উচ্চতর অরবিটে পাঠানোর জন্য স্যাটেলাইটকে বুস্ট দেওয়া হয়। ধ্বংসের মুখ থেকে বেঁচে যায় ক্রায়োস্যাট-২।

কী ভাবছেন, এই সমস্যার সমাধান কি এতটাই সহজ? আসলে না। কারণ এর আগেও অনেক স্যাটেলাইটের সংঘর্ষ ঘটেছে এবং দিন দিন সংঘর্ষের ঝুঁকি বেড়ে চলেছে। এর পেছনে অন্যতম কারণ হচ্ছে স্যাটেলাইটের ট্রাফিক জ্যাম। এখন স্পেইসে স্যাটেলাইটের অভাব নেই।

শুধু ২০১৭ সালেই কমার্শিয়াল কোম্পানি, মিলিটারি, সিভিল ডিপার্টমেন্ট এবং যারা নতুন তারা ২০০০-২০১০ সালের মোট স্যাটেলাইটের সংখ্যা থেকে ৪ গুণ বেশি স্যাটেলাইট লঞ্চ করে। এমন অনেক কোম্পানি রয়েছে যেমন- Boeing, Oneweb এবং SpaceX প্রভৃতি। বর্তমানে মেগা কনস্টেলেশন প্রজেক্টের মাধ্যমে মহাকাশে স্যাটেলাইট পাঠানোর হিড়িক উঠেছে। মহাকাশে স্যাটেলাইট পাঠানোর এই প্রতিযোগিতা আরও কয়েক গুণ বৃদ্ধি পাবে বলে বলছেন গবেষকরা।

২০০৯ সালে US Iridium Satellite-এর সাথে রাশিয়ান কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট cosmos-2251-এর সংঘর্ষ ঘটে। এর ফলে প্রচুর পরিমাণ আবর্জনা সৃষ্টি হয় যা বাকি স্যাটেলাইটের জন্য হুমকিস্বরূপ। এছাড়া আরও কৃত্রিম পদার্থ (২০ হাজারেরও বেশি) স্পেসে অবস্থান করছে, যেমন: সোলার প্যানেল, রকেটের টুকরো ইত্যাদি।

ক্রায়োস্যাট-২ এর মতো সবসময় স্যাটেলাইটকে বুস্ট দেওয়া সম্ভব না। কেননা তা সময়সাপেক্ষ এবং প্রচুর জ্বালানি দরকার। জ্বালানি বেশি খরচ হয়ে গেলে স্যাটেলাইটের মুখ্য কাজটাই করা হবে না। যদিও অনেক দল এই সমস্যা সমাধানের জন্য কাজ করে যাচ্ছে।

কেউ কেউ স্যাটেলাইটের সিস্টেম উন্নত করার প্রস্তাব দিয়েছেন যাতে স্যাটেলাইট দূর থেকে বস্তুর আকার এবং আকৃতি চিহ্নিত করতে পারে। এরপর সেই আকার আকৃতি অনুসারে নিজেই নিজের অবস্থান পরিবর্তন করে নিতে পারে। অন্যরা বিশেষ অরবিট খোঁজার জন্য ট্রাই

করছেন। তাদের চিন্তাটা এমন যে মিশন শেষ হওয়ার পর তারা স্যাটেলাইট সেখানেই অবস্থান করবে এবং বার্ন-আপ হবে। কিন্তু অনেক বিজ্ঞানীদের মতে এই বিকল্প পন্থাগুলো সম্ভব না। কিছু অনিয়ন্ত্রিত স্পেস ক্র্যাশ অধিক পরিমাণ ধ্বংসাবশেষ উৎপন্ন করতে পারে।

জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক রিসার্চার ক্যারোলিনের মতে "এভাবে চলতে থাকলে, ফিরেও যাওয়া সম্ভব না।" প্রশ্ন জাগতেই পারে, মহাকাশের এই অবস্থার শুরু আসলে কীভাবে হলো?

১৯৬০ সালে ইউএস মিলিটারি প্রজেক্ট লাখ লাখ ক্ষুদ্র কপার নিডল পাঠায় স্পেইসে যাকে বলা হয় 'West Ford Project'। ওয়াল্টার মরোউ মূলত এই প্রজেক্ট পরিচালনা করেন। কমিউনিকেশন বুস্ট পাওয়ার জন্য এই ধাপ নেওয়া হয়। কিন্তু এতে প্রচুর স্পেইস জাঙ্ক সৃষ্টি হয়।

বিজ্ঞানের ইতিহাসবিদ লিসার মতে, "এটা ছিল স্পেইস পরিষ্কার রাখার জন্য (গুরুত্ব হিসেবে) প্রথম দৃষ্টান্ত." সাম্প্রতিক সময়ের অনেক গবেষকদের মতে, মহাকাশে থাকা ৯৫% কৃত্রিম বস্তু হচ্ছে অব্যবহৃত স্যাটেলাইট। ২০১৯ সালের দিকে ইলন মাস্ক সিদ্ধান্ত নেন গ্লোবাল ইন্টারনেট অ্যাক্সেসের জন্য SpaceX ৬০টি কমিউনিকেশন স্যাটেলাইট লঞ্চ করবে। তবে এই 'megaconstellations' মহাবিশ্ব অবজার্ভেশনের জন্য বাঁধা হয়ে দাঁড়াবে। আবার রেডিয়ো ফ্রিকুয়েন্সির কারণে বিকৃতিও ঘটে। ছবি তোলার সময় উজ্জ্বল ধারার সৃষ্টি করে এবং অরবিটে অত্যধিক স্যাটেলাইটের কারণে সংঘর্ষের ঝুঁকি বেড়ে যায়।

এই স্পেইসফ্লাইট কোম্পানি স্টারলিংক স্যাটেলাইট লঞ্চ করার সিদ্ধান্ত নেয়। ঝামেলা হচ্ছে পরিমাণগত দিক থেকে বাড়ার কারণে উজ্জ্বল ধারা ততই সৃষ্টি হচ্ছে। যদিও অনেকে যেমন জার্মান জ্যোতির্বিজ্ঞানী অলিভিয়ার মতে, যদি ২৭ হাজারের মতো স্যাটেলাইট লঞ্চ করা হয় তাহলে ESO telescope এর অভজার্ভিং টাইম 0.৮% ফুরিয়ে যাবে অর্থাৎ অবজার্ভ করার সময় বাধাগ্রস্থ হবে।

কিন্তু The US Large Synoptic Survey Telescope (LSST) সিদ্ধান্ত নেয় তারা ডার্ক ম্যাটার এবং ডার্ক এনার্জি নিয়ে রিসার্চ করার জন্য রাত্রিবেলা সময় ঠিক করেছে গবেষণার জন্য (টনি টাইসনের মতামত); শুধু অবজার্ভিং টাইম অপচয় হবে তা নয়। উজ্জ্বল স্যাটেলাইট

দ্বারা ক্যামেরার সেন্সরকে স্যাচুরেট এবং ভুল সংকেত প্রদান কররার সম্ভাবনা থেকে যাবে। এই সমস্যা বিশেষ করে গ্রীষ্মকালে হয়, তখন স্যাটেলাইট আরও দৃশ্যমান হয়, যা LSST এর জন্য বাধাস্বরূপ।

এছাড়া রেডিয়ো ইনফারেন্স অনেক ধরনের বাধা সৃষ্টির কারণ। স্যাটেলাইটগুলো গ্রাউন্ড স্টেশনের সাথে সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য ফ্রিকুয়েন্সি ব্যবহার করে; যা রেডিয়ো অ্যাস্ট্রোনোমি অবজার্ভেশনের জন্য বাধাস্বরূপ।

স্যাটেলাইট কমিনিউকেশনের জন্য যে যে তরঙ্গদৈর্ঘ্য ব্যবহার করা হয়, তা রেডিয়ো এস্ট্রোনোমাররাও মহাবিশ্ব পর্যবেক্ষণে এই তরঙ্গদৈর্ঘ্য ব্যবহার করে থাকেন। স্টারলিংক -এর মতো কোম্পানিগুলো এখনও এর সমাধান খুঁজে পায়নি। SpaceX সমস্যা সমাধানের জন্য পদক্ষেপ নিলেও 'ন্যাচার' জার্নালের অনুসন্ধানের মতে তাদের সমস্যা সমাধানের প্রক্রিয়া স্থগিত রাখা হয়েছে।

লম্বা কাহিনী যদি ছোট্ট করে বলি, স্যাটেলাইটগুলোর অতিরিক্ত ভিড়ের কারণে টেলিস্কোপ দিয়ে মহাকাশ পর্যবেক্ষণে বাধা আসে এবং স্পেইস জাঙ্কের কারণে স্যাটেলাইটের সংঘর্ষ হলে অনেক ক্ষতি হয়। যার সমাধান এখনো পাওয়া দুষ্কর।

তথ্যসূত্র:

[1] Witze, A. (2018). The quest to conquer Earth's space junk problem. Nature, 561(7721), 24-27.

[2] Witze, A. (2019). SpaceX launch highlights threat to astronomy from'megaconstellations'. Nature, 575(7782), 268-270.

[3] Witze, A. 'Unsustainable': how satellite swarms pose a rising threat to astronomy. Nature.

[4] Witze, A. (2020). How satellite'megaconstellations' will photobomb astronomy images. Nature.

আপনি কি বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, গণিত নিয়ে লেখালেখি করেন?

তাহলে আপনাকেই খুঁজছে ট্যাকিয়ন। আপনার লেখালেখির হাত আরও পাকাপোক্ত করতে যোগ দিন ট্যাকিয়নের লেখক দলে। মাসশেষে সেরা লেখকদের দেওয়া হবে আকর্ষণীয় পুরষ্কার।

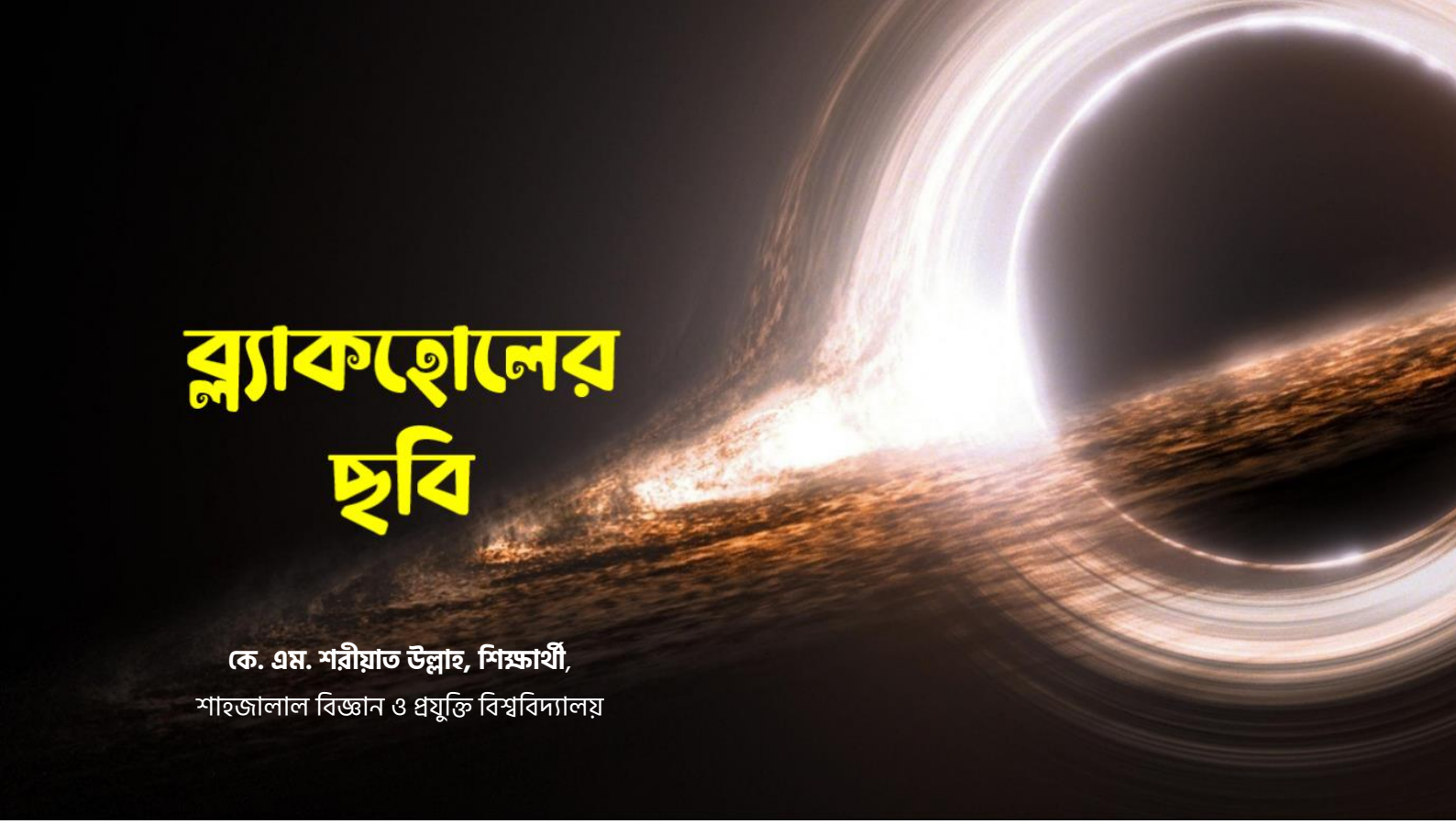

ব্ল্যাকহোলের ছবি

কে. এম. শরীয়াত উল্লাহ, শিক্ষার্থী,
শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা অবশেষে আমাদের গ্যালাক্সির কেন্দ্রে থাকা অতিদানবীয় ব্ল্যাকহোল স্যাজিটেরিয়াস এ* এর ছবি প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছেন। এই ছবির সাহায্যে এটিই প্রতীয়মান হয় যে, মহাবিশ্বের অধিকাংশ গ্যালাক্সির কেন্দ্রেই একটি সুপারম্যাসিভ ব্ল্যাকহোল বাস করে। এই ছবিটি একই সাথে আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতা তত্ত্বের পক্ষে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ বহন করে। ইভেন্ট হোরাইজন টেলিস্কোপের ৩০০ -এর অধিক গবেষকদের একটি দলের সমন্বিত প্রচেষ্টায় এই ছবিটি প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে ২০২২ সালের ১২ মে।

বিজ্ঞানীদের ধারণা মতে, আমাদের মিল্কিওয়ে গ্যালাক্সির কেন্দ্রেও একটি সুপারম্যাসিভ ব্ল্যাকহোল রয়েছে। যাকে স্যাজিটেরিয়াস এ* বা সংক্ষেপে একে SGR A* (উচ্চারণ স্যাজ এ স্টার) ডাকা হয়। ব্লাকহোলটির আশেপাশের বস্তু তীব্র মহাকর্ষ ক্ষেত্রের প্রভাবে একে কেন্দ্র করে ঘুরতে থাকে। ব্ল্যাকহোলকে কোনোভাবেই দেখা সম্ভব না। তবে এর আশেপাশে থাকা নক্ষত্রগুলো একে কেন্দ্র করে ঘোরে। তাই বিজ্ঞানীরা যখন দেখলেন আমাদের গ্যালাক্সির কেন্দ্রীয় অঞ্চলকে ঘীরে আমাদের গ্যালাক্সির তারারা ঘুরছে, সেখান থেকে তারা ধারণা করে নিলেন এখানে একটি দৈত্যাকৃতির ব্ল্যাকহোল রয়েছে। তারাগুলো কয়দিন পরপর নিজ কক্ষপথ একবার প্রদক্ষিণ করে আসে সেই সময়ের পর্যবেক্ষণ থেকে জানা যায়, স্যাজিটেরিয়াস এ* এর ভর আমাদের সূর্যের থেকে ৪০ লক্ষ গুণ অধিক ভরবিশিষ্ট।

ব্ল্যাকহোল এমন একটি রহস্যময় বস্তু যার নির্দিষ্ট ক্ষেত্রের মধ্যে আলোর কণার মতো গতিশীল কণাও ঢুকলে আর বের হতে পারে না। আলোর কণা বের হতে পারে না বলে ব্ল্যাকহোলকে আমরা দেখতে পাই না। কিন্তু ব্ল্যাকহোলের বাইরের দিকে অ্যাক্রিশন ডিস্ক নামে একটা অঞ্চল আছে। এই অ্যাক্রিশন ডিস্কে প্রচুর পরিমাণে মহাজাগতিক ধূলিকণা থাকে। ব্ল্যাকহোলের আকর্ষণে এরা প্রচন্ড গতিতে ব্ল্যাকহোলের চারপাশে ঘুরতে থাকে। এসকল কণার গতি অনেক বেশি হওয়ায় এরা নিজেদের মধ্যে প্রচন্ড সংঘর্ষেও লিপ্ত হয়। সংঘর্ষের সময় প্রচন্ড তাপ উৎপন্ন হয়। এই তাপ রেডিয়ো সিগন্যাল ও এক্স-রে সিগন্যাল হিসেবে অ্যাক্রেশন ডিস্ক থেকে নির্গত হয়।

স্যাজিটেরিয়াস এ* থেকে ২৭০০০ আলোকবর্ষ দূরে রয়েছে আমাদের পৃথিবী। পৃথিবীতে বসে আমরা যদি এত দূরের একটি বস্তুর স্পষ্ট ছবি তুলতে চাই, তাহলে আমাদের লাগবে অনেক বড়ো আর অত্যাধুনিক মানের একটি ক্যামেরা। জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের জন্য এই ক্যামেরাটি

হচ্ছে রেডিয়ো টেলিস্কোপ। অ্যাক্রেশন ডিস্ক থেকে যে রেডিও সিগন্যাল বের হচ্ছে সেই সিগন্যাল মহাকাশের চারিপাশে ছড়িয়ে পড়ে। এর মধ্যে কিছু সিগন্যাল পৃথিবীতেও আসে। পৃথিবীতে যেসব রেডিয়ো সিগন্যাল আসছে, সেসব সিগন্যাল পৃথিবীতে বসানো রেডিয়ো টেলিস্কোপগুলো ডিটেক্ট করতে পারে। এই সিগন্যালগুলো পরবর্তীতে রেডিয়ো টেলিস্কোপগুলো রেকর্ড ও বিশ্লেষণ করে দ্বি-মাত্রিক ছবিতে পরিণত করে।

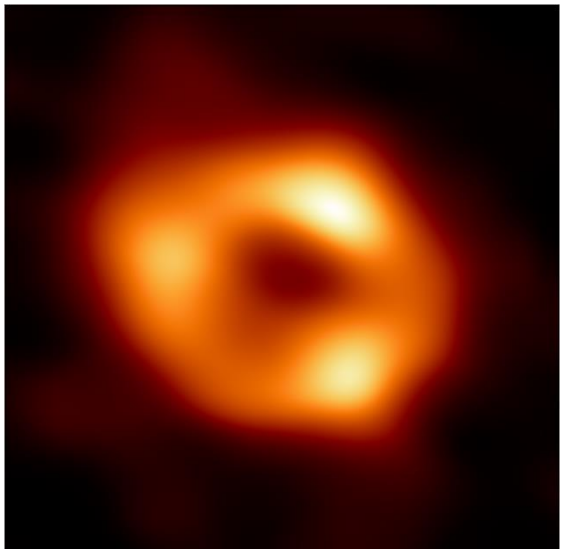

ব্ল্যাকহোলের আক্রেশন ডিস্ক থেকে আসা রেডিয়ো সিগন্যাল বিশ্লেষণ করে দ্বি-মাত্রিক চিত্র তৈরি করেন বিজ্ঞানীরা।

স্যাজিটেরিয়াস এ* ব্ল্যাকহোলের ছবি তোলার ক্ষেত্রে একটি চ্যালেঞ্জ ছিল টেলিস্কোপের সাইজ নিয়ে। এত দূরের একটি ব্ল্যাকহোলের ছবি তোলার ক্ষেত্রে আমাদের প্রয়োজন পৃথিবীর সমান একটি টেলিস্কোপের। কিন্তু পৃথিবীর সমান একটি টেলিস্কোপ তো আর বানানো সম্ভব না। তাহলে কী করার? এর জন্য বিজ্ঞানীরা একটি চমকপ্রদ পদ্ধতি ব্যবহার করলেন।

রেডিয়ো টেলিস্কোপ তার পরাবৃত্তাকার ডিশের সাহায্যে রেডিয়ো সিগন্যালগুলোকে কালেক্ট করে। এটিকে অনেকটা বালতিতে পানি সংরক্ষণ করে রাখার মতো। বালতি যত বড়ো হবে, তত বেশি পানি রাখা যাবে। একইভাবে রেডিয়ো টেলিস্কোপের ডিশ যত বড়ো হবে, একক সময়ে তত বেশি সিগন্যাল কালেক্ট করতে পারবে। কিন্তু যদি পৃথিবীর সমান বালতি না বানানো যায় তাহলে? তাহলে একটা কাজ করা যায়। পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় অনেকগুলো ছোটো ছোটো বালতি রেখে দেওয়া যায়। পরে সেই ছোটো ছোটো বালতি থেকে পানি নিয়ে একটি বড়ো বালতিতে ঢেলে নিলেও কিন্তু কাজ হয়ে যাবে, পৃথিবীর সব জায়গা থেকে পানি নেওয়াটা কিন্তু হবে। একই কাজ বিজ্ঞানীরা রেডিয়ো টেলিস্কোপের ক্ষেত্রে করলেন। তারা পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের আটটি রেডিয়ো টেলিস্কোপকে রেডিয়ো সিগন্যাল সংগ্রহের কাজে লাগালেন। সেখান থেকে প্রতিটি আলাদা আলাদা করে রেডিয়ো সিগন্যাল নেওয়া হলো। পরে সব সিগন্যাল একত্র করে একটি ছবি তৈরী করা হলো। এই আটটি রেডিয়ো টেলিস্কোপকে একত্রে বলা হয় ইভেন্ট হোরাইজন টেলিস্কোপ। আর অনেকগুলো টেলিস্কোপকে এক করে এমন একটি টেলিস্কোপের মতো কাজ করানোর পদ্ধতিকে বলা হয় রেডিয়ো ইন্টারফেরোমেট্রি।

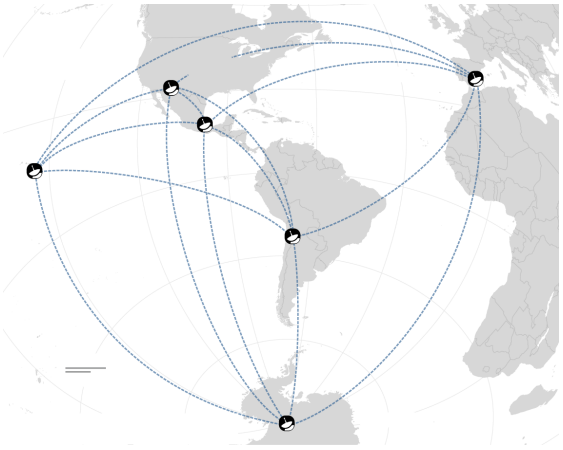

পৃথিবীর আটটি রেডিয়ো মানমন্দির এক সাথে মিলে তৈরি করে ভেরি লং বেইজলাইন ইন্টারফেরোমিটার। এটি দিয়েই দুইটি ব্ল্যাকহোলের ছবি তোলা হয়েছে।

এর আগেও ২০১৯ সালে বিজ্ঞানীরা মেসিয়ার ৮৭ নামক গ্যালাক্সির কেন্দ্রে থাকা দৈত্যাকার সুপারম্যাসিভ ব্ল্যাকহোলের ছবি আমাদের সম্মুখে প্রকাশ করতে সমর্থ হয়েছিলেন। মেসিয়ার ৮৭ গ্যালাক্সি আমাদের গ্যালাক্সি থেকেও হাজারগুণে বড়ো। এর আকার বড়ো হওয়ায় এর চারপাশের মহাজাগতিক ধুলিকণাও সময় নিয়ে একে প্রদক্ষিণ করে। কিন্তু স্যাজাটেরিয়াস এ* এর আকার তুলনামূলক অনেক ছোটো। ফলে মহাজাগতিক ধূলিকণাগুলো কয়েক মিনিটের মধ্যেই ব্ল্যাকহোলকে কেন্দ্র করে ঘুরে আবার আগের জায়গায় চলে আসে। তাই এখানে সময় স্বল্পতার কারণে সিগন্যাল নেওয়াটা

কষ্টসাধ্য। এটির ধুলিকণাগুলো খুব দ্রুত আগের অবস্থানে ফিরে আসতে পারে বলে, আগের ব্ল্যাকহোলটির ছবির চেয়ে এই ব্ল্যাকহোলটির ছবিতে রিং-টি অধিক স্পষ্ট। একই সাথে এতে তিনটি উজ্জ্বল স্পট দেখা যাচ্ছে, যেখানে আগের ছবিতে কেবল একটি স্পটই দেখা যাচ্ছিল।

স্যাজিটেরিয়াস এ* এর রিং-এর ছবির ব্যাপারে ইভেন্ট হোরাইজন টেলিস্কোপের প্রজেক্ট সায়েন্টিস্ট Geoffrey Bower বলেন, "এই রিংটির আকার আইনস্টাইনের জেনারেল থিওরি অব রিলেটিভির সাথে এতটাই খাপ খেয়ে গেছে যে এটি দেখে আমরা অনেক আশ্চর্যান্বিত হয়ে গিয়েছিলাম।"

ব্ল্যাকহোলের ছবি তোলার অ্যালগরিদম, যন্ত্রপাতি ও নানা কলাকৌশল দিনদিন আরো উন্নত হচ্ছে। এই ছবি তোলার মাধ্যমে আমরা বারবার আইনস্টাইনের রিলেটিভিটিকে পরীক্ষার মধ্যে ফেলতে পারছি একই সাথে ব্ল্যাকহোলের ব্যাপারে জানতে পারছি নিত্য নতুন তথ্য।

তথ্যসূত্র -

১] মেসিয়ার ৮৭ গ্যালাক্সির কেন্দ্রে থাকা ব্ল্যাকহোলের ছবির ব্যাপারে জানতে দেখুন Telescope, E. H. (2019). Astronomers capture first image of a black hole. https://eventhorizontelescope.org/press-release-april-10-2019-astronomers-capture-first-image-black-hole

২] Telescope, E.H. (2022). Astronomers Reveal First Image of the Black Hole at the Heart of Our Galaxy. https://eventhorizontelescope.org/blog/astronomers-reveal-first-image-black-hole-heart-our-galaxy

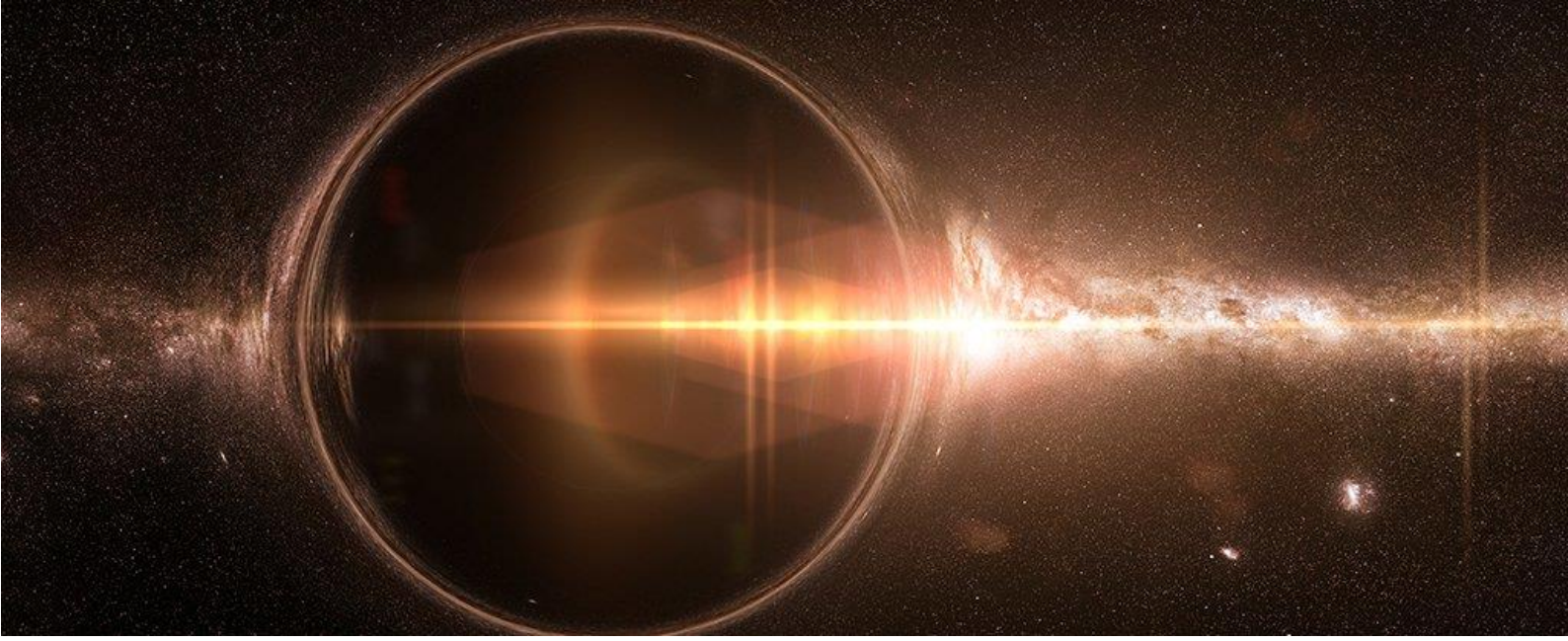

হকিং রেডিয়েশন করে ব্ল্যাকহোলের মৃত্যু

রুশলান রহমান দীপ্ত

শিক্ষার্থী, মিলিটারি ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স এন্ড টেকনোলজি, ঢাকা

"Universe didn't start to exist to exist forever"

- Matt o'dowd

মহাবিশ্ব চিরস্থায়ী নয়। আর এটি যা যা দিয়ে গঠিত সেগুলোও চিরস্থায়ী নয়। মহাবিশ্বের ভয়ানক স্থানগুলোর মধ্যে ব্ল্যাকহোল (BlackHole) অন্যতম। ভয়ানক বলতে এটি এমন এক সত্ত্বা, যার একটি নির্দিষ্ট সীমার অধিক নিকটে গেলে আপনি আর ফিরে আসবেন না। আইন্সটাইনের জেনারেল রিলেটিভিটির একটি প্রেডিকশন ছিল এই ব্ল্যাকহোল। কিন্তু তা সম্পূর্ণ তাত্ত্বিক। যেমন: এই ব্ল্যাকহোলের কোনো শুরু বা শেষ নেই, নেই কোনো চার্জ, নেই কোনো ঘূর্ণায়ন। একে সোয়ার্জস্কাইল্ড ব্ল্যাকহোলও বলে। মনে রাখতে হবে, এটি ব্ল্যাকহোলের একটি মডেল ছিল শুধু। যা দিয়ে ব্ল্যাকহোলের আচরণ, বৈশিষ্ট্য বুঝতে চাচ্ছিলেন পদার্থবিজ্ঞানীরা। বাস্তব জগতে এর সৃষ্টি হয়, ধ্বংসও হয়। ব্ল্যাকহোল ফিজিক্সে একটি সেলিব্রেটি ফিগার। তাই, এর পরিচয় নিয়ে আর কথা বাড়ালাম না।

'তাপগতিবিদ্যার' নাম শুনেছেন নিশ্চয়ই? তাপগতিবিদ্যায় ৪টি সূত্র আছে। বিজ্ঞানী জ্যাকব বেকেনস্টাইন ব্ল্যাকহোল নিয়েও ৪টি সূত্র দেন। ব্ল্যাকহোল থার্মোডাইনামিক্স-এর ভিত্তিই এই সূত্রগুলো। সূত্রগুলো সহজে বলতে গেলে–

শূন্যতম সূত্র - কোনো ব্ল্যাকহোলের ক্ষেত্রফল সমান থাকলে তার সম্পূর্ণ ক্ষেত্রফল জুড়ে মহাকর্ষ বল সমান থাকবে।

- প্রথম সূত্র - ব্ল্যাকহোলে কোনো শক্তি প্রদান করা হলে তা ব্ল্যাকহোলের ক্ষেত্রফল, চার্জ, ঘূর্ণায়ন পরিবর্তন করে দেয়।
- দ্বিতীয় সূত্র - ব্ল্যাকহোলের ক্ষেত্রফলের মান স্থির থাকে অথবা বৃদ্ধি পায়। তবে কখনও হ্রাস পায় না।
- তৃতীয় সূত্র - শূন্য মানের মহাকর্ষ বলবিশিষ্ট ব্ল্যাকহোল পাওয়া সম্ভব নয়।

দ্বিতীয় সূত্রটি লক্ষ্য করুন, সূত্রটি বলছে ব্ল্যাকহোলের ক্ষেত্রফল হ্রাস পায় না। এই সূত্রে একটি ফাঁকি আছে। বেকেন্সটাইনের সূত্র মতে, ব্ল্যাকহোলের ক্ষেত্রফল এর ভরের উপর নির্ভর করে। ভর বাড়লে ব্ল্যাকহোলের ক্ষেত্রফল বেড়ে যায়। কিন্তু যদি ভর কমে? ব্ল্যাকহোলের ভর কি আদৌ কমা সম্ভব? এখানেই স্টিফেন হকিং তার জাদু দেখানো শুরু করেন। হকিং দেখান এক বিশেষ প্রক্রিয়ার ব্ল্যাকহোলের ভর কমতে পারে (একটি নয় বরং দুটি, আরেকটি হচ্ছে পেনরোজ প্রসেস)। হকিং বিখ্যাত

বিজ্ঞান সাময়িকী ন্যাচার-এ ‘Blackhole explosion’ নামে একটি গবেষণাপ্রবন্ধ প্রকাশ করেন। সেখানে তিনি দেখান বক্র স্থান-কালে কোয়ান্টাম ফিল্ডের আচরণ দিয়ে প্রমাণ করা যায় যে, ব্ল্যাকহোলও হকিং রেডিয়েশন করে ভর কমাতে পারে। যেহেতু কোয়ান্টাম ফিল্ড থিওরি ও জেনারেল রিলেটিভিটিকে একত্র করে নতুন কোনো থিওরি এখনও দেওয়া সম্ভব হয়নি, তাই তিনি ‘Bogoliuvob transformation’ নামের একটি গাণিতিক টুলের সাহায্য নেন। যা বক্র স্পেসটাইমে কোয়ান্টাম ফিল্ডের আচরণ নিয়ে মোটামুটি ধারণা দেয়। এটি সম্পর্কে আপাতত আমাদের না জানলেও চলবে। এখন আসি হকিং রেডিয়েশন কেন হয়।

‘কোয়ান্টাম ফিল্ড থিওরি’ নামে কোয়ান্টাম পদার্থবিজ্ঞানের একটি যুগান্তকারী তত্ত্ব আছে। এর মতে, মহাবিশ্বে সর্বত্র বিছিয়ে দেওয়া আছে কোয়ান্টাম ফিল্ড। যে ইলেকট্রনকে আমরা অতি সূক্ষ্ম, শক্ত কণা বলে জানি তা হচ্ছে মূলত ইলেকট্রন ফিল্ডে কম্পন। এমনিভাবে কোয়ার্ক ফিল্ডের কম্পন হচ্ছে কোয়ার্ক, নিউট্রিনো ফিল্ডে কম্পন হচ্ছে নিউট্রিনো নামের কণা। এখানে 'কোয়ান্টাম' শব্দটি যুক্ত হয়েছে কারণ এই ফিল্ডগুলো ম্যাক্স প্ল্যাঙ্কের কোয়ান্টাম থিওরি মেনে চলে। ফিল্ডগুলো সব সময় একটি নূন্যতম শক্তির স্বাভাবিক সংখ্যার গুণিতক পরিমাণ শক্তি নিয়ে কম্পিত হতে থাকে। একে বলে ফিল্ডের কোয়ান্টাইজেশন। কিন্তু মনে রাখতে হবে ফিল্ডগুলোর নূন্যতম শক্তি কিন্তু শূন্য হতে পারে না। হাইজেনবার্গের অনিশ্চয়তা নীতি মতে, কোনো সিস্টেমে উপস্থিত শক্তির পরিমাণ আমরা কখনো সুনির্দিষ্টভাবে নির্ধারণ করে বলে দিতে পারব না। ফলে আমরা এও বলতে পারব না যে, কোনো নির্দিষ্ট সময়ে যে-কোনো ফিল্ডে শক্তির পরিমাণ শূন্য। যাই হোক, যখন কোনো ফিল্ডে যে-কোনো রকমের মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে বাইরে থেকে শক্তি প্রদান করা হয়, তখন সে শক্তি ফিল্ডে কম্পন বৃদ্ধি করে। আর এই কম্পন বড়ো মাপের কণা হিসেবে আমাদের কাছে প্রতীয়মান হয়। এখানে একটা জিনিস আগেই পরিষ্কার করে নেওয়া উচিত। তা হলো ফিল্ড দ্বারা কী বোঝানো হচ্ছে? আর এই ফিল্ডের কম্পনই বা কী?

আসলে এই ফিল্ড হচ্ছে একটি ত্রিমাত্রিক সত্ত্বা যা শূন্যস্থানে অবস্থান করে। স্পেইস-এর প্রত্যেকটা পয়েন্টে একটি নির্দিষ্ট মান ধারণ করে এই ফিল্ডগুলো। শূন্যস্থানে সমান সংখ্যক পজিটিভ ফ্রিকুয়েন্সির কম্পন আর নেগেটিভ ফ্রিকুয়েন্সির কম্পন সমদশায় উপরিপাতন ঘটে। তাই, একটি অন্যটিকে প্রতিনিয়ত নাকচ (Cancel out) করে দেয়। পজিটিভ ফ্রিকুয়েন্সিগুলো ম্যাটাররূপে আর নেগেটিভ ফ্রিকুয়েন্সি অ্যান্টি-ম্যাটার রূপে দেখা যায়। সাইড নোট হিসেবে জেনে রাখতে পারেন যে, অ্যান্টিম্যাটারকে নেগেটিভ ফ্রিকুয়েন্সি না ধরে যদি সময়ের বিপরীতে যাওয়া পজিটিভ ফ্রিকুয়েন্সি ধরি তাহলেও ভুল হবে না। এবার কিছু সহজ জিনিস মাথায় রাখুন। সামনে কাজে দেবে,

১. পজিটিভ আর নেগেটিভের আচরণ সম্পূর্ণ উলটো,

২. পজিটিভ ফ্রিকুয়েন্সি যদি কোনো কারণে কমে যায়, সেই একই কারণ নেগেটিভ ফ্রিকুয়েন্সিতে দিলে নেগেটিভ ফ্রিকুয়েন্সি বেড়ে যাবে।

এবার আসুন আসল কথায়। আমরা প্রায় সবাই জানি ব্ল্যাকহোলের কাছাকাছি সময় ধীরে প্রবাহিত হয়। যার জন্য এর মহাকর্ষ বলের টান প্রচণ্ড। এখন ভাবুন তো সাধারণ বস্তু যদি ব্ল্যাকহোলের কাছে যায় তাহলে কী হবে? অবশ্যই বস্তুর জন্য সময় ধীরে চলবে। কিন্তু সেখানে যদি অ্যান্টিম্যাটার ফেলি? তার কী হবে? ভেবেছেন কখনো? তার জন্য সময় দ্রুত চলবে। শূন্যস্থানে ব্ল্যাকহোলের কথা চিন্তা করুন, একই কথা। ব্ল্যাকহোল তার চারপাশে শূন্যস্থানে থাকা কোয়ান্টাম ফিল্ডের পজিটিভ কম্পনগুলোকে ধীর করে দেবে (সময় ধীরে চললে ফ্রিকুয়েন্সি কমে যায়) আর নেগেটিভ কম্পনগুলোকে বাড়িয়ে দেবে। এতে আগে যে পজিটিভ নেগেটিভ উপরিপাতন ঘটিয়ে একে অপরকে নাকচ করছিল তা আর হচ্ছে না। তাই আপনি ব্ল্যাকহোলের চারপাশে শূন্যস্থানে দূর থেকে দেখতে পাবেন কণা-প্রতিকণার খেলা। এটাই হকিং রেডিয়েশন।

নতুন যে কণা-প্রতিকণা সৃষ্টি হলো এতে শক্তির সংরক্ষণশীলতা ভেঙে গেল না? না, ব্ল্যাকহোল তার শক্তি হারাবে ভররূপে। ভর হারিয়ে এর ক্ষেত্রফল হ্রাস পেতে থাকবে। হকিং দেখান, ক্ষেত্রফল তাপমাত্রার ব্যাস্তানুপাতিক। ব্ল্যাকহোল যত ছোটো হবে এর তাপমাত্রা তত বৃদ্ধি পাবে। একসময় গরম হতে হতে প্রচণ্ড বিস্ফোরণের মাধ্যমে ব্ল্যাকহোল তার জীবন শেষ করবে। এবার বুঝলেন তো হকিং এর পেপারের নাম ‘Blackhole explosion’ কেন?

সবসময় হকিং রেডিয়েশন দেখতে পাওয়া যায় না। কারণ, মহাবিশ্ব একটি সুপার ম্যাসিভ ব্ল্যাকহোলের চেয়ে গরম। তাই ব্ল্যাকহোল শূন্যস্থান থেকেও তাপ শোষণ করে। রেডিয়েশন সাধারণত করে না। যেগুলোর ভর কম তারা করতে পারে।

আরও একটি মজার ঘটনা হচ্ছে আপনি ব্ল্যাকহোলে পতিত হতে থাকলে হকিং রেডিয়েশন দেখবেন না। কারণ সময় আপনার জন্য তখন ঠিকঠাকই আছে। একমাত্র যারা দেখতে পায় যে ব্ল্যাকহোলের চারপাশে সময় ধীরে চলছে, তারাই দেখতে পারবে এই রেডিয়েশন।

হকিং রেডিয়েশনের এই ব্যাখ্যাটা কি একটু অন্যরকম লাগছে? ভার্চুয়াল পার্টিক্যাল নিয়ে আরেকটা ব্যাখ্যা ছিল না? আসলে হকিং এর পেপারের মূল প্রতিপাদন ছিল ফিল্ড নিয়ে। পরবর্তীতে একে সরলীকরণ করা হয় জনসাধরণের জন্য। যা হোক, 'হকিং রেডিয়েশন করে ব্ল্যাকহোলের মৃত্যু' এমন খবর হয়তো আমরা না-ও পেতে পারি। এর জন্য বিলিয়ন বিলিয়ন সময় দরকার। এই রেডিয়েশন আসলে অনেক ধীর। আপাতত থিওরি, কল্পনা ও গাণিতিক সূত্র দিয়েই আমাদের হকিং রেডিয়েশনের পেছনে থাকা বিজ্ঞানের মজাটা লুফে নিতে হবে।

বুয়েট থেকে বিশ্বজয়

শাকির আহমেদ

শিক্ষার্থী, বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়

এবছর সিগন্যাল প্রসেসিং কাপ ২০২২ এ মোট ১২টি দেশ থেকে ২৩টি দল অংশ নেয় যার মধ্যে বাংলাদেশও রয়েছে। গর্বের সাথে জানানো যাচ্ছে যে, এ বছর বাংলাদেশ থেকে প্রেরিত বুয়েট শিক্ষার্থীদের দুটি দল চূড়ান্ত পর্যায়ের দুটি আসন লাভ করে। দলদ্বয়ের মধ্যে 'সিন্থেসাইজার' বিজয়ীর আসন এবং 'স্টুডেন্টস প্রোকাস্টিনেটিং' তৃতীয় আসন দখল করে নেয়। এছাড়া ভারতের আইআইটি হায়দ্রাবাদের দল 'আইআইটিএইচ' অবশিষ্ট আসনটি লাভ করে।

ইনস্টিটিউট অফ ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ার্স (IEEE) তড়িৎ প্রকৌশলীদের সর্ববৃহৎ আন্তর্জাতিক প্রফেসনাল সংগঠন। এর সিগন্যাল প্রসেসিং সোসাইটি প্রতি বছর অস্নাতক শিক্ষার্থীদের জন্য 'সিগন্যাল প্রসেসিং কাপ' নামক একটি প্রতিযোগিতার আয়োজন করে থাকে। সিগন্যাল প্রসেসিং -এর মাধ্যমে বাস্তবভিত্তিক সমস্যা সমাধানে উদ্বুদ্ধ করাই এর লক্ষ্য। বিভিন্ন দেশ থেকে নানা সংখ্যক দল এই প্রতিযোগিতায় অংশ নিয়ে থাকে এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে মোট তিনটি দল পাঁচ হাজার ইউএস ডলার জেতার জন্যে লড়ে থাকে। প্রতি দল ৩ থেকে ১০ জন অস্নাতক, সর্বোচ্চ ১ জন স্নাতক এবং ১ জন অনুষদ সদস্যের সমন্বয়ে গঠিত হয়। এ প্রতিযোগিতার প্রথম স্টেজটি হলো 'Open competition'; এতে শর্ত পূরণকারি যে-কোনো দল অংশ নিতে পারে। এ স্টেজে মোট ৩টি দলকে বাছাই করা হয় এবং এই ৩ দলের অন্তিম লড়াই হয় ICASSP -তে। উল্লেখ্য ম্যাথ ওয়ার্কস, ইনক এবং IEEE সিগন্যাল প্রসেসিং সোসাইটি -এর প্রণোদনায় সিগন্যাল প্রসেসিং কাপ আয়োজিত হয়ে থাকে।

এ বছরের বিষয় ছিল "A forensic challenge related to synthetic speech attribution"। সিন্থেতিক স্পিচ হলো কৃত্রিম উপায়ে তৈরি করা শব্দ (অডিয়ো) যা মানুষের কণ্ঠের মতো শোনা যায় করে। কম্পিউটার সিস্টেমের সাহায্যে নানা অ্যালগরিদম ব্যবহার করে সিনথেটিক স্পিচ তৈরি করা হয়। এবারের

প্রতিযোগিতায় সিনথেটিক স্পিচ -এর অডিয়ো রেকডিং প্রদান করা হয়, যা থেকে বের করা লাগবে, স্পিচটি কোন অ্যালগরিদম ব্যবহার করে তৈরি করা হয়েছে। এ উদ্দেশ্যে প্রতিযোগিদের স্পিচ ডিটেকটিং সিস্টেম তৈরি করতে হয়েছে যা সিগন্যাল প্রসেসিং এবং মেশিন লার্নিং ব্যবহার করে প্রদত্ত স্পিচ সিগন্যালকে বিশ্লেষণ করে। এবারে প্রতিযোগিতায় তাদেরকে পাঁচটা কণ্ঠস্বর দেওয়া হয়েছিল। সঙ্গে ছিল কয়েক হাজার নমুনা কণ্ঠ।

এ বিষয়টির গুরত্ব বর্তমানে ব্যাপক। এখন সহজেই অডিয়ো, ভিডিয়ো, ছবির ইডিট করা সম্ভব। এর ফলে অহরহ বাস্তবতার বিকৃতি ঘটিয়ে নানা ধরনের অসৎ উদ্দেশ্য সাধন করা হচ্ছে। তাই প্রকৃত এবং বিকৃত বা কৃত্রিম ছবি, ভিডিয়ো বা অডিয়োর পার্থক্য করা অতিব প্রয়োজনীয়। তাই এবারের প্রতিযোগিতায় নানাভাবে তৈরিকৃত অডিয়োর উপর গুরত্ব দেয়া হয়।

সবচেয়ে বড়ো গাছ

জেনারেল শ্যারমান বা Sequoiadendron giganteum গাছ পৃথিবীতে এখন পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া সবচেয়ে বড়ো গাছ। ধারণা করা হয়, এর বয়স ২২০০ থেকে ২৭০০ বছর। উচ্চতায় এটা ২৭৫ ফুট। এর আগে ক্রেনেল ক্রিক জায়ান্ট বা Sequoia sempervirens নামে আরেকটি বৃহৎ বৃক্ষ ছিল। তবে ১৯৪০ -এর দিকে গাছটি কেটে ফেলা হয়। সেই বৃক্ষটি জেনারেল শ্যারমান থেকেও লম্বা ছিল। তাই, বর্তমানে অক্ষত অবস্থায় আছে এমন সবচেয়ে বড়ো গাছ হচ্ছে জেনারেল শ্যারমান।

কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার নতুন আবিষ্কার!

মো: আবদুর রাহিম,
শিক্ষার্থী, ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি

কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা, এমন একটা সিস্টেম যেখানে মেশিনকে দিন দিন নতুন নতুন বিষয় শিখানোর জন্য অনেক বিজ্ঞানী এবং ইঞ্জিনিয়ার কাজ করে যাচ্ছেন। তারা এমন সব অ্যালগরিদম উদ্ভাবন করছেন যার মাধ্যমে আমাদের প্রতিদিনের জীবন হয়ে উঠছে আরও স্মার্ট। খেয়াল করলে দেখা যাবে প্রতিদিনই এমন না এমন কিছু আসছে যার কারণে আমাদের চারপাশের অনেক কিছু প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পরিবর্তন হচ্ছে, সেটা হোক শেখা, কাজ, নর্মাল লাইফ, বিনোদন ইত্যাদি।

কিন্তু কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা -এর একটি সিস্টেম ডেভেলপ করা প্রচুর জটিল। আর এই বিষয় সহজ করার জন্যই অনেক বিজ্ঞানী কাজ করে যাচ্ছেন। তারই একটা ফলাফল হিসেবে বলা যায় ‘CHICAGO’ সিস্টেমের নাম। এই সিস্টেমটি প্রেজেন্ট করেছেন স্যামুয়েল ডিলাভু (পদার্থবিজ্ঞানী, ইউনিভার্সিটি অব পেনসিলভানিয়া)। তার এই বিষয়ে মতামত ছিল, 'আমরা শিখছি যে কীভাবে কিছু শিখতে হয়'।
শিকাগো সার্কিট নিয়ে শুরু করার আগে আমরা প্রচলিত কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা সিস্টেম যেভাবে কাজ করে তা নিয়ে বুঝার চেষ্টা করি।

মেশিন লার্নিং সিস্টেমে এখনকার সবচেয়ে প্রচলিত টুলের নাম হলো নিউরাল নেটওয়ার্ক। এই নেটওয়ার্ক কম্পিউটারের মেমরিতে প্রসেস করা হয়। নেটওয়ার্কের কম্পোনেন্টগুলোকে বলা হয় 'নোড' আর প্রতিটা নোড একে অপরের সাথে কানেক্টেড থাকে। নোডগুলো কন্ট্রোল করা হয় ০ অথবা ১ দিয়ে এবং নোডগুলা লেয়ার আকারে সাজানো থাকে। একদম প্রথম লেয়ারে ডেটা ইনপুট নেয়ার কাজ করা হয়। মধ্য মাল্টিপল লেয়ার থাকে যা প্রসেসিং-এর কাজ করে। শেষ লেয়ারে প্রসেসড ডেটার রেজাল্ট আউটপুট দেয়া হয়।

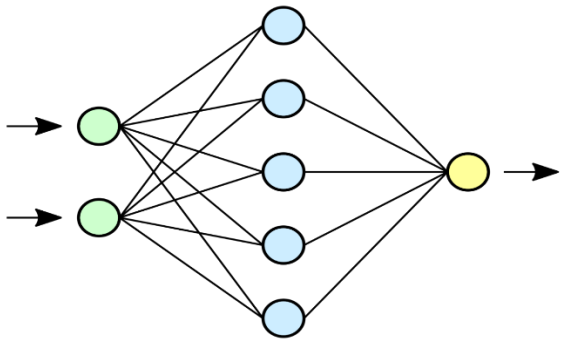

নিউরাল নেটওয়ার্ক।

সিস্টেমকে ট্রেনিং দেওয়ার জন্য ডাটা হিসেবে ছবি দেয়া হয় কম্পিউটারকে এবং প্রসেস করে প্রতিটি নোডে জমা করা হয়। সে অনুসারে নোডগুলো অপ্টিমাইজডভাবে সাজিয়ে রাখা হয়। ডেটা প্রসেসের পরে নেটওয়ার্কের

প্রতিটি নোডে প্রতিনিয়ত আপডেট দেয়া হয়। একে বলা হয় টিউনিং। কিন্তু ইনপুট সাইজ যত বাড়ে এই কাজের ফ্লো এবং মেইন্টেনেইন্স খরচ অনেক বেশি হয়ে যায়। এই সমস্যা সমাধানের জন্য বিজ্ঞানীরা চেষ্টা করছেন পুরো প্রক্রিয়াকে একটি ফিজিক্যাল সিস্টেমে কনভার্ট করার জন্য, যেখানে পুরো ফ্লো আর এক্সটার্নাল ক্যালকুলেশন যা কম্পিউটার দিয়ে করানো হতো তা একটি মেশিন সম্পাদন করবে। এতে করে প্রসেসিং স্পিড, মেমরি সেভিং এবং টিউনিং নিয়ে অনেকাংশেই মাথা ব্যাথা কমে যাবে।

এই জায়গায় বাজিমাত করে শিকাগো সার্কিট। ১৬টা আলাদা আলাদা অ্যাডজাস্টেবল রেজিস্টর বা রোধকে তার দ্বারা সংযুক্ত করে একটি নেটওয়ার্কের মতো বানানো হয়েছে, যেখানে প্রতিটি রোধের লিডের কানেশন নোড হিসেবে এবং রোধ কাজ করে নেটওয়ার্কের পাথ হিসেবে। নেটওয়ার্কটি চালানোর সময় কিছু নোডের মধ্য ভোল্টেজ ইনপুট দেয়া হয় তারপর আউটপুট নোডের ভোল্টেজ ক্যালকুলেশন শেষে সংগ্রহ করা হয়। এই সিস্টেমকে কম কম্পিউটেশন পাওয়ার আর মেমরি দিয়ে ট্রেনিং-এর জন্য দুটি সার্কিট মার্জ করে একটি সার্কিটে কনভার্ট করা হয়েছে। এতে করে এখন সিস্টেমে দুইটি নেটওয়ার্ক। প্রথম নেটওয়ার্ককে বলা হয় 'ক্ল্যাম্পড নেটওয়ার্ক' দ্বিতীয়টিকে বলা হয় 'ফ্রি নেটওয়ার্ক'। প্রথম দিকে ক্লাম্পড নেটওয়ার্ক -এর ইনপুট এবং আউটপুট ভোল্টেজ ফিক্সড করা হয়েছিল আর ফ্রি নেটওয়ার্কের শুধু ইনপুট ভোল্টেজ ফিক্স করা হয়েছিল আর আউটপুটকে ফ্রি করে দেয়া হয়েছে ক্যালকুলেশনের রেজাল্ট পাওয়ার জন্য। কিন্তু প্রথমে এই প্রসিডিউর মেইন্টেইন করে সিস্টেমে আউটপুট ঠিক মতো পাওয়া যায়নি। তখন এই সিস্টেমে কিছু অ্যাডজাস্টমেন্ট নিয়ে আসা হয়, ক্লাম্পড নেটওয়ার্ক ও ফ্রি নেটওয়ার্কের আপ-ডাউন ভোল্টেজের ভিত্তিতে সার্কিটটিকে স্ট্যাবল করা হয়। তখন এই সার্কিটে আউটপুট ঠিকমতো আসা শুরু করে। ফিজিক্যাল সিস্টেমটি রেডি হয়ে যাবার পরে, টিউনিং-এর ক্ষেত্রে খুবই কম কম্পিউটেশন মেমরি দরকার হচ্ছিল। যেহেতু এখন সিস্টেমটি ফিজিক্যালভাবেই কাজ করছে আর এই কাজটা করা হয়েছে ছোট একটা মেশিন দিয়ে যার নাম কম্পারেটর। কম্পারেটরের সাহায্য দুইটা নেটওয়ার্ক-এর আপ ডাউন ভোল্টেজ ট্রাক রেখে সে হিসেবে টিউনিং হয়। এই হচ্ছে পুরো সার্কিট এর কাজের সারমর্ম।

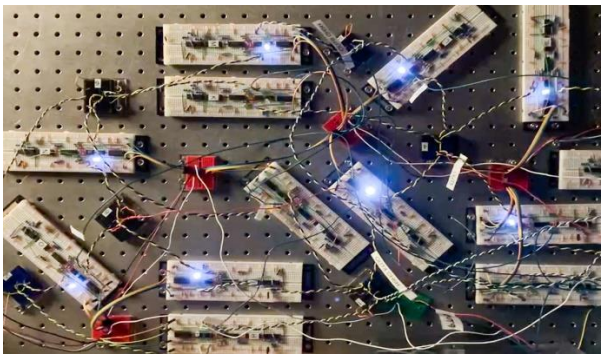

ডিলাভ্যু মিটিং-এ আরও বলেন, এই সার্কিটের সাহায্য বিভিন্ন ধরনের কাজ করা যায়। যেমন: কোন ফুলগাছের পাঁপড়ি আর বৃতাংশ এর দৈর্ঘ্য, প্রস্থ দেখে ফুল গাছ শনাক্ত করতে পারে। এমনকি এই শনাক্তকরণে এই মেশিনের অ্যাকুরেসি ৯৫%! এই টেস্ট করা হয়েছে ক্যানোনিক্যাল বেইসড AI Standard প্রসিডিউর -এর সাহায্য। এই টেস্টের জন্য ১৫০ সেট ছবি ব্যবহার করা হয় আর এর মধ্য ইনপুট দেয়া হয়েছিলো মাত্র ৩০ সেট ছবিকে।

এই উদ্ভাবন নিশ্চয়ই কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তায় অন্য গতি এনে দিবে। কারণ এই পুরো সার্কিটকে মাইক্রোচিপ আকারে নিয়ে আসা সম্ভব আর এটি মাইক্রোচিপ আকারে চলে আসলে নিউরাল নেটওয়ার্কের নতুন যুগ চলে আসবে এবং তখন এই চিপের সাহায্যে হয়তো আরও জটিল প্রবলেম সলভ করা সম্ভব হবে। হয়তো আমরা আরও চমক দেখতে পারব প্রযুক্তির দুনিয়ায়।

তথ্যসূত্র - "Simple electrical circuit learns on its own—with no help from a computer". www.science.org

বাংলাদেশে জ্যোতির্বিজ্ঞান মানমন্দিরের ভবিষ্যৎ

মোস্তফা কামাল পলাশ
আবহাওয়া বিজ্ঞানী, ইউনিভার্সিটি অব সাসকাচেওয়ান, কানাডা

অধ্যাপক মুহম্মদ জাফর ইকবাল এর পরিচয় একজন অধ্যাপক ও বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী লেখক হিসাবে। অধ্যাপক জাফর ইকবাল দীর্ঘ দিন থেকে বাংলাদেশের বিভিন্ন পত্রিকায় মতামত কলাম লিখে আসছেন। অধ্যাপক মুহম্মদ জাফর ইকবাল আমার সরাসরি শিক্ষক। একসময় জাফর স্যারের লেখাগুলো অনেক আগ্রহ সহকারে পড়লেও সাম্প্রতিক সময়ের মতামত কলামগুলো পড়ার আর কোনো আগ্রহ পাই না। সত্য কথা বলতে কী জাফর স্যারের লেখা কলামগুলো পড়া প্রায় ছেড়ে দিয়েছি গত কয়েক বছর ধরে। স্যারের মতামত কলামগুলোর বিষয়ে আগ্রহ হারানোর অন্যতম প্রধান কারণ হলো স্যারের সাম্প্রতিক কালের বিজ্ঞান বিষয়ক অনেক লেখাতে বৈজ্ঞানিক যুক্তির অপেক্ষা সস্তা আবেগ প্রাধান্য পাওয়া। যার সর্বশেষ উদাহরণ হলো জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞান চর্চা ও গবেষণার জন্য ফরিদপুর জেলার ভাঙ্গা উপজেলায় জাতীয় মানমন্দির সংক্রান্ত একটি প্রস্তাবনা, "একটি স্বপ্ন, বিডিনিউজ২৪ডটকম, ২৭ শে জুন, ২০১৯"।

যে দেশের প্রায় ৫৩টি পাবলিক এবং ১০৩টি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনোটিতেই জ্যোতির্বিজ্ঞান বা অ্যাস্ট্রোনমির কোনো স্নাতক ডিগ্রি পড়ানো হয় না, সেই দেশে উনি শত কোটি টাকা খরচ করে জ্যোতিঃপদার্থবিজ্ঞান চর্চা ও গবেষণার জন্য একটি মানমন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য দেশের সরকার প্রধানের দৃষ্টি আকর্ষণ করে কলাম লিখেছেন জাফর স্যার। স্যারের প্রস্তাবনা শুনে গ্রাম বাংলার জনৈক সওদাগরের ঘোড়ার পূর্বে চাবুক কেনার গল্পের কথা মনে পড়ে গেল।

জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ে বাংলাদেশে কয়েকটা শৌখিন ক্লাব ও সেগুলোর সাথে জড়িত কিছু শৌখিন জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চাকারি সেচ্ছাসেবী সংগঠন থাকলেও প্রাতিষ্ঠানিক পড়ালেখা করা মানুষ ১০জনও আছে কি না আমি সন্দিহান। আমি নিজেও শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় ঐরকম একটা ক্লাবের সাথে জড়িত ছিলাম। শুধু জড়িত ছিলাম বললে কম বলা হবে। পর্যায়ক্রমে ঐ ক্লাবের প্রচার সম্পাদক, সহ-সাধারণ সম্পাদক ও সহ-সভাপতি ছিলাম। ঐ ক্লাবের আন্ডারে

শাবিপ্রবিতে মহাকাশ পর্যবেক্ষণ বিষয়ক কর্মশালা আয়োজনে নেতৃত্ব দিয়েছি; এবং প্রথম টেলিস্কোপের মাধ্যমে মহাকাশ পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা করেছি।

জাফর ইকবাল স্যারের প্রস্তাবের সবচেয়ে যুক্তিহীন অংশটা হলো প্রস্তাবিত জাতীয় মানমন্দিরটি ফরিদপুর জেলার ভাঙ্গা উপজেলায় স্থাপনের প্রস্তাব করা। ঐস্থানে মানমন্দিরটি স্থাপনের প্রধান যুক্তি হিসাবে যে কারণটি দেখিয়েছেন তা হলো:

"আমার কাছে মনে হয়েছে কর্কট ক্রান্তি এবং ৯০ ডিগ্রি পূর্ব দ্রাঘিমার ছেদবিন্দু এই জায়গাটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং বলা যায়, এটি সারা পৃথিবীর একমাত্র এরকম একটি জায়গা। মাদাগাস্কার ওপর দিয়ে মকরক্রান্তি গিয়েছে এবং শুনেছি সেটাকেই তারা গুরুত্ব দিয়ে রক্ষা করার ব্যবস্থা করেছে। আমাদের বেলায় শুধু কর্কট ক্রান্তি নয়, তার সাথে ৯০ ডিগ্রি পূর্ব দ্রাঘিমাও আছে এবং সেটি একটি নির্দিষ্ট বিন্দু। বলা যেতে পারে এটি হচ্ছে একটা মানমন্দির তৈরি করার জন্য একেবারে আদর্শ -তম জায়গা।"

বাস্তবতা হলো যে, মানমন্দির স্থাপনের জন্য কোনো স্থানের অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ কোনো প্রধান বিবেচ্য বিষয় না। এমনকি প্রধান ২০ বা ৩০ বিষয়ের একটিও না। মানমন্দির স্থাপনের জন্য প্রধান বিবেচ্য বিষয় হলো কোনো স্থানের আবহাওয়া, জলবায়ু ও সমুদ্র সমতল থেকে উচ্চতা। আমি কেন বলছি যে ফরিদপুর জেলায় দেশের প্রথম মানমন্দিরটি স্থাপন মানহীন যুক্তি ও হাস্যকর প্রস্তাবনা তার বিস্তারিত লিখেছেন বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও বিজ্ঞান বিষয়ক জনপ্রিয় লেখক ফারসীম মান্নান মোহাম্মদী স্যার। বাংলাদেশে জ্যোতির্বিজ্ঞান বা অ্যাস্ট্রোনমি বিষয়ক প্রাতিষ্ঠানিক চর্চার পথিকৃতও বলা চলে ওনাকে। বাংলা ভাষায় জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক একাধিক বই লিখেছেন ফারসীম মান্নান মোহাম্মদী।

জাফর ইকবাল স্যারের প্রস্তাবিত মানমন্দির ফরিদপুর জেলায় স্থাপনের সাথে দ্বিমত প্রকাশ করে তথ্য-উপাত্ত দিয়ে ফারসীম মান্নান মোহাম্মদী স্যার বিডিনিউজ২৪ডটকমে ৭ই জুলাই, ২০১৯ "জ্যোতির্বিজ্ঞান গবেষণা এবং জাতীয় মানমন্দির স্থাপনা বিষয়ে" শিরোনামে একটি মতামত প্রকাশ করেছেন। ফারসীম স্যারের লেখার কিছু অংশ উদ্ধৃত করলাম –

"মানমন্দির স্থাপনের কিছু সুনির্দিষ্ট শর্ত আছে- আবহমণ্ডলীয় সুস্থিতি, পরিষ্কার আকাশ মেঘমুক্ত থাকার অনুপাত, বাতাসের প্রবাহ-আর্দ্রতা-ঘনত্ব, বাতাসে অ্যারোসল কিংবা অন্য কণার উপস্থিতি এবং দূষণ-মুক্ত (ধূলি ও আলো) পরিবেশ, উঁচু স্থান, কিছুটা লোক-বর্জিত নির্জনতা, আর্দ্রতা-মুক্ত আবহ, বিশ্ববিদ্যালয়ের নৈকট্য ও গবেষণা-পরিচালনার সক্ষমতা, প্রয়োজনীয় রসদের সুলভতা ও সরবরাহ নিশ্চিত করা, ভূমির সিসমিক সক্রিয়তা, বন্যা ও অন্যান্য মানদণ্ড। এরকম প্রায় ১১টি সুনির্দিষ্ট শর্তের বহুমাত্রিক সিদ্ধান্ত (multi-criteria decision analysis) বিবেচনার (এর কোনোটি না হলে হবে না এমন নয়, তবে কিছু শর্তের প্রয়োজন আছে যদি আপনি প্রকৃত পর্যবেক্ষণ, পরিমাপন ও ডেটা সংগ্রহে আগ্রহী হন) মাধ্যমে মানমন্দিরের স্থান নির্দিষ্ট করা উচিত।" ফারসীম মান্নান মোহাম্মদী স্যার বিডিনিউজ২৪ডটকমে ৭ই জুলাই, ২০১৯

আপনারা অনেকেই অবগত আছেন যে, ২০১৯ সালের এপ্রিল মাসে জ্যোতিঃপদার্থ বিজ্ঞানীরা প্রথমবারের মতো ব্ল্যাকহোল -এর ছবি প্রকাশ করেছিলেন। ইতোমধ্যেই আমাদের গ্যালাক্সির কেন্দ্রে থাকা ব্ল্যাকহোলের ছবিও প্রকাশ করতে সক্ষম হয়েছেন বিজ্ঞানীরা। সেই ছবি তোলা হয়েছিল পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে অবস্থিত বিশাল আকারের ৮টি রেডিয়ো টেলিস্কোপের (যে টেলিস্কোপ দ্বারা অন্য গ্রহ-উপগ্রহ থেকে আগত রেডিয়ো তরঙ্গ গ্রহণ করা হয়) সাহায্যে যেগুলোকে সমন্বিতভাবে বলে 'Event Horizon Telescope'। ওই ৮টি রেডিও টেলিস্কোপের ২টি চিলিতে, ৩টি আমেরিকায়, ১টি স্পেনে, ১টি মেক্সিকো ও ১টি দক্ষিণ মেরুর বিভিন্ন পাহাড়ের শীর্ষে অবস্থিত। ঐ ৮টি টেলিস্কোপের নাম ও সেগুলো কোন উচ্চতায় অবস্থিত তা নিম্নে উল্লেখ করা হলও।

- The Atacama Large Millimeter/submillimeter Array

(ALMA) (চিলির আতাকামা মরুভূমির উপরে অবস্থিত; উচ্চতা ৫ হাজার ৬০ মিটার)

- The Atacama Pathfinder Experiment (APEX) (চিলির আতাকামা মরুভূমির উপরে অবস্থিত; উচ্চতা ৫ হাজার ১০০ মিটার)
- Heinrich Hertz Submillimeter Telescope (আমেরিকার অ্যারিজোনা রাজ্যের একটি পর্বতের ৩ হাজার ১৮৪ মিটার উচ্চতায় অবস্থিত)
- James Clerk Maxwell Telescope (আমেরিকার হাওয়াই রাজ্যের মাউনা কেয়া পর্বতের ৪ হাজার ৯২ মিটার উচ্চতার একটি শীর্ষে অবস্থিত)
- The Submillimeter Array (SMA) (আমেরিকার হাওয়াই রাজ্যের মাউনা কেয়া পর্বতের ৪ হাজার ৮০ মিটার উচ্চতায় একটি শীর্ষে অবস্থিত)
- The Large Millimeter Telescope (মেক্সিকোর একটি পাহাড়ের ৪ হাজার ৬৪০ মিটার উচ্চতার একটি শীর্ষে অবস্থিত
- IRAM 30m telescope (স্পেনের একটি পাহাড়ের ২ হাজার ৮৫০ মিটার উচ্চতার একটি শীর্ষে অবস্থিত)
- The South Pole Telescope (SPT) (দক্ষিণ মেরুর একটি পাহাড়ের ২ হাজার ৮০০ মিটার উচ্চতার একটি শীর্ষে অবস্থিত)

আপনি প্রশ্ন করতে পারেন কেন মহাকাশ গবেষণার জন্য স্থাপিত টেলিস্কোপগুলো সাধারণ স্থানে না বসিয়ে পাহাড়ের শীর্ষে স্থাপন করা হয়ে থাকে? উত্তরটা আপনার পড়া স্কুল জীবনের সাধারণ বিজ্ঞান কিংবা ভূগোল বই এ পড়েছেন। মনে করিয়ে দিচ্ছি। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের অন্যতম উপাদান হলো জলীয়বাষ্প। যে জলীয়বাষ্প সময়ে সময়ে ঘনীভূত হয়ে প্রথমে মেঘে পরিণত হয় ও এর পরে বায়ু সম্পৃক্ত হলে বৃষ্টি আকারে ভূ-পৃষ্ঠে পতিত হয়। বায়ুমণ্ডলের সর্বনিম্ন স্তরকে বলে ট্রপোসফিয়ার, যার উচ্চতা পৃথিবী পৃষ্ট থেকে প্রায় ১২ থেকে ১৬ কিলোমিটার। পৃথিবী পৃষ্ট থেকে যদি ১২ কিলোমিটার উচ্চতার মই তৈরি করা হয় ও সেই মই বেয়ে আপনি উপরে উঠতে থাকেন, তবে প্রতি কিলোমিটার উপরে উঠার ফলে তাপমাত্রা প্রায় ১০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড কমতে থাকবে। এই একই কারণে প্রায় ৯ কিলোমিটার উচ্চতার হিমালয় পর্বতের উপরে তাপমাত্রা থেকে মাইনাস ৪০ থেকে ৬০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড। বিজ্ঞান বইতে আপনারা আর একটা বিষয় শিখেছেন যে গরম বাতাসের জলীয়বাষ্প ধারণ ক্ষমতা বেশি ঠান্ডা বাতাস অপেক্ষা। যেহেতু ভূপৃষ্ঠ থেকে উপরের দিকে বাতাসের তাপমাত্রা কমতে থাকে, তাই ভূপৃষ্ঠ অপেক্ষা উপরের বাতাসে জ্বলীয় বাষ্পের পরিমাণও কমতে থাকে। মাইনাস ২০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় বাতাসে জলীয়বাষ্পের পরিমাণ প্রায় শূন্যের কোঠায় নেমে আসে।

কোনো স্থানে মহাকাশ গবেষণার জন্য স্থাপিত টেলিস্কোপগুলো বসানোর প্রধান শর্ত হলো ওই স্থানের বাতাসে জলীয়বাষ্পের পরিমাণ কত কম। যে কারণে প্রতিটি দেশ মহাকাশ গবেষণার জন্য টেলিস্কোপগুলো স্থাপন করলে সেই দেশের সবচেয়ে উঁচু স্থানটি নির্বাচন করে, যাতে করে অন্য গ্রহ-উপগ্রহ থেকে আগত মহাকর্ষীয় তরঙ্গ বাতাসে অবস্থিত জলীয়বাষ্প দ্বারা সর্বনিম্ন পরিমাণ শোষিত হয়। পৃথিবী পৃষ্ঠের যে-কোনো স্থানে টেলিস্কোপ স্থাপন করা হোক না কেন অন্য গ্রহ-উপগ্রহ থেকে আগত মহাকর্ষীয় তরঙ্গ বাতাসে অবস্থিত জলীয়বাষ্প দ্বারা শোষিত হওয়ার সমস্যা থেকেই যায়। যে সমস্যাটি দূর করার জন্য ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন মহাকাশে একটি টেলিস্কোপ পাঠাতে যাচ্ছে ব্ল্যাকহোলের ছবি (নির্দিষ্ট করে বলতে বলতে হয় ব্ল্যাকহোলের ইভেন্ট হরাইজনের ছবি) আরও নিখুঁতভাবে তোলার জন্য। ভূপৃষ্ঠের জলীয়বাষ্প সমস্যার জন্য যে একই কারণে আমেরিকার মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা ইতোমধ্যেই মহাকাশে পাঠিয়েছে হাবল টেলিস্কোপ ও জেমস ওয়েব স্পেস টেলিস্কোপ।

উপরে দেখেছেন ব্ল্যাকহোল -এর ছবি তোলার জন্য যে ৮টি টেলিস্কোপ ব্যবহার করা হয়েছে, তার ২টি চিলির আতাকামা মরুভূমিতে স্থাপন করা। এখানে সবাইকে মনে করিয়ে দিতে চাই যে, চিলির আতাকামা মরুভূমি

হলো পৃথিবীর দুই মেরু ব্যতীত মূল ভূখণ্ডের শুষ্কতম স্থান। এই মরুভূমিতে এমনও স্থান রয়েছে যে স্থানে সারা বছরে কোনো বৃষ্টিপাত হয় না। ঠিক এই বৈশিষ্ট্যের কারণে পৃথিবীতে মহাকাশ গবেষণায় শীর্ষস্থানীয় প্রায় প্রতিটি দেশ নিজস্ব গবেষণা টেলিস্কোপ বসিয়েছে সেখানে।

কোনো স্থানে মহাকাশ গবেষণার জন্য স্থাপিত টেলিস্কোপগুলো বসানোর আর একটি প্রধান শর্ত হলো ঐ স্থানের বাতাসে প্রতি ঘনমিটারে উপস্থিত ধূলিকণা, রাসায়নিক পদার্থের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণা যেগুলোকে সমন্বিতভাবে এরোসল কণা বলে তাদের পরিমাণ। বাংলাদেশের বায়ু দূষণ নিয়ে যারা গবেষণা করে বা সামান্যতম ধারণা রাখে তারা জানেন যে, সারা বাংলাদেশের মধ্যে বায়ুতে সবচেয়ে বেশি এরোসল কণার উপস্থিতি থাকে ঢাকা থেকে দেশের পশ্চিম অঞ্চলের জেলা গুলোতে। বায়ু দূষণ পরিমাপের জন্য যে সূচক ব্যবহার করা হয়ে থাকে, তা হলো প্রতি ঘনমিটারে পার্টিকুলেট ম্যাটার এর পরিমাণ। এক ঘনমিটারের মধ্যে কত মাইক্রোগ্রাম পার্টিকুলেট ম্যাটার আছে। পার্টিকুলেট ম্যাটার হলো বাতাসের মধ্যে বিভিন্ন ধূলিকণা, ময়লা, আবর্জনা, লতা-পাতার ভগ্নাংশ, ফুলে রেণু ইত্যাদিকে বুঝায়। সাইজ অনুসারে পার্টিকুলেট ম্যাটারকে দুই ভাগে ভাগ করা হয়ে থাকে:

ব্যাস ২ দশমিক ৫ মাইক্রোমিটার (PM 2.5) বা তার চেয়ে ক্ষুদ্র ও ১০ মাইক্রোমিটার এর চেয়ে ছোটো। ১ মাইক্রোমিটার হলো ১ মিটারের ১০ লক্ষ ভাগের এক ভাগ বা ১ মিলিমিটারের ১ হাজার ভাগের এক ভাগ। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার মতে, গ্রহণযোগ্য ২ দশমিক ৫ মাইক্রোমিটার ব্যাস-এর পার্টিকুলেট ম্যাটার-এর পরিমাণ এক ঘনমিটারের মধ্যে সর্বোচ্চ ১০ মাইক্রোগ্রাম ও ১০ মাইক্রোমিটার ব্যাস-এর পার্টিকুলেট ম্যাটার-এর পরিমাণ প্রতি ঘনমিটারের সর্বোচ্চ ২০ মাইক্রোগ্রাম। PM 2.5 এতটাই ক্ষুদ্র যে তা চোখে দেখা যায় না।

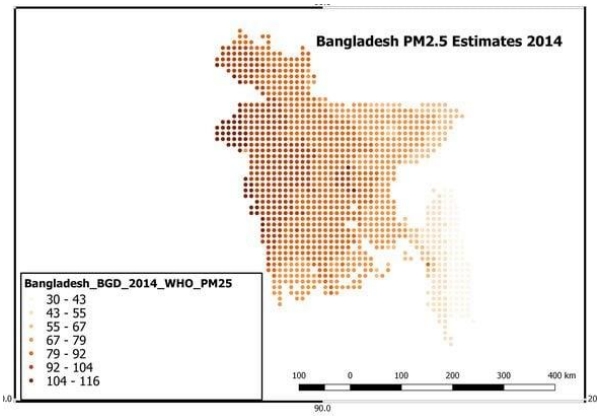

ঢাকা প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষক এম এম হক ও তার সহযোগীরা ২০১৩ সালের ১২ই ডিসেম্বর গাজীপুরে PM 2.5 এর ঘনত্ব পেয়েছে প্রতি ঘনমিটারে ২৩১ দশমিক ৫ মাইক্রোগ্রাম ও ২০১৪ সালের জানুয়ারি মাসে ঢাকায় PM 2.5 এর ঘনত্ব পেয়েছে ২৪৬ দশমিক ৫ মাইক্রোগ্রাম। অর্থাৎ বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার গ্রহণযোগ্য মাত্রার চেয়ে প্রায় ২৫ গুণ বেশি পরিমাণ PM 2.5 বিদ্যমান। ঢাকার ও তার চারপাশের শহরগুলোতে PM 10 এর ঘনত্বও ১৫ থেকে ২৫ গুণ বেশি। নিচে বাংলাদেশের আকাশে PM 2.5 এর ঘনত্ব এর পরিমাণ এর একটি মানচিত্র সংযুক্ত করলাম যে, মানচিত্রটি আমি নিজে তৈরি করেছি আমেরিকান মহাকাশ গবেষণা সংস্থা নাসা এর কৃত্রিম ভূ-উপগ্রহ হতে প্রাপ্তচিত্র বিশ্লেষণ করে সেই সাথে নাসার কৃত্রিম ভূ-উপগ্রহ হতে প্রাপ্ত একটি চিত্রও সংযুক্ত করে দিলাম, যা থেকে ভারত ও বাংলাদেশের আকাশে বায়ু দুষণের পরিমাণ বোঝা যায়। এই চিত্র হতে পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে যে, ফরিদপুর জেলার আকাশে ব্যাপক পরিমাণ এরোসল কণা উপস্থিত থাকে ও বাংলাদেশের অন্যতম বায়ু দুষিত এলাকা। একই মানচিত্র থেকে দেখা যাচ্ছে যে, পার্বত্য চট্টগ্রামের বান্দরবন, খাগড়াছতি ও রাঙ্গামাটি জেলা হলো সারা বাংলাদেশের সবচেয়ে কম বায়ু দূষণ সম্পন্ন জেলা। একই সাথে এই জেলা ৩টি সমুদ্র সমতল থেকে বাংলাদেশের সবচেয়ে উঁচু স্থানে অবস্থিত।

এইবার ভেবে দেখুন তো, জাফর ইকবাল স্যার বাংলাদেশের প্রথম মানমন্দিরটি স্থাপনের জন্য ফরিদপুর জেলার ভাঙ্গা উপজেলাকে মনোনীত করেছে তা উপরে

বর্ণিত রেডিয়ো টেলিস্কোপ স্থাপনের প্রধান ৩টি শর্ত (উচ্চতা, বাতাসে জলীয়বাষ্পের পরিমাণ ও বাতাসে এরোসল কণা উপস্থিতি) পূরণ করে কি না?

রেডিও টেলিস্কোপ স্থাপনের অন্য একটি শর্ত হলো লোকালয় ও কৃত্রিম আলো উৎস থেকে মানমন্দিরের স্থানটি যেন যথেষ্ট দূরে অবস্থিত হয় যাতে করে শহরের কৃত্রিম আলো, টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা ও প্রচার মাধ্যমে তরঙ্গ অন্য গ্রহ-উপগ্রহ থেকে আগত রেডিয়ো তরঙ্গকে দুষিত না করে।

আরও ডজন সংখ্যা ব্যাখ্যা প্রদান করা যাবে যে জাফর ইকবাল স্যার প্রস্তাবিত ফরিদপুর জেলার ভাঙ্গা উপজেলা মহাকাশ গবেষণার জন্য রেডিয়ো টেলিস্কোপ স্থাপনের জন্য কোনো আদর্শ স্থান না; এমনকি বলা চলে সারা বাংলাদেশের সবচেয়ে অযোগ্য স্থান।

আশা করি বাংলাদেশ সরকার প্রস্তাবিত "বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মানমন্দির" স্থাপন করার জন্য বাংলাদেশের সবচেয়ে আদর্শ স্থানটিকে নির্বাচন করবেন যুক্তিহীন আবেগ বর্জন দিয়ে। যুক্তিহীন আবেগ দিয়ে আর যাই হউক বিজ্ঞান চর্চা হয় না এই কথাটা আমরা যত তাড়াতাড়ি বুঝব তত দ্রুত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে এগিয়ে যাবে বাংলাদেশ। নইলে বরাবরের মতো এশিয়ার দেশগুলোর তালিকায় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিতে পিছন দিক থেকেই প্রথম হতে হবে নিয়মিতভাবে; যে স্থানে আমরা ইতিমধ্যেই অবস্থান করছি।

২৭ শে জুন ২০১৯ বিডিনিউজ২৪ডটকম সংবাদ মাধ্যমের মতামত কালামে 'একটি স্বপ্ন' নামে প্রকাশিত জাফর ইকবাল স্যারের কলাম :

https://opinion.bdnews24.com/bangla/archives/56766?fbclid=IwAR1J-yceHVKpKmUThK3P8Lusy-HARQY4N6iZ4rXpkQCjwrUmBGZKNmF7XH4

বাংলাদেশে জ্যোতি:পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ে বাংলাদেশ তরুণ প্রজন্মকে অনুপ্রাণিত করার অন্যতম কারিগর বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও বিজ্ঞান বিষয়ক জনপ্রিয় লেখক ফারসীম মান্নান মোহাম্মদী স্যার ৭ ই জুলাই, ২০১৯ বিডিনিউজ২৪ডটকমে ব্যাখ্যা করেন কেন ফরিদপুর জেলা কোনো যুক্তিতেই উপযুক্ত স্থান না মানমন্দির স্থাপনের জন্য:

https://opinion.bdnews24.com/bangla/archives/56832?fbclid=IwAR0wj9z_EvXNArQ2Jxf_p9yYR5TLyydebeiV6PjgzLYN_SKQhmLzIoZi1nw

সূর্য ছুঁয়েছে পার্কার?

রাশিদ সাবাব মোফরাদ
শিক্ষার্থী, হাশেমিয়া কামিল মাদরাসা, কক্সবাজার।

এ বছরের শুরুর দিকে বিভিন্ন পত্রিকার শিরোনাম হিসেবে দেখা যাচ্ছিল নাসা'র মহাকাশযান 'পার্কার সোলার প্রোব' নাকি সূর্য ছুঁয়েছে! আমরা জানি, সূর্যের পৃষ্ঠীয় তাপমাত্রা প্রায় ৫০০০-৬০০০ কেলভিনের কাছাকাছি। তবে ভীষণ এই উত্তপ্ত তাপমাত্রায় উক্ত প্রোবটা কীভাবে টিকে থাকতে পারল? পুড়ে ছাড়খার হয়ে যায়নি কেন প্রশ্নটি হয়তো আপনার মাথাতেও এসেছে।

প্রোবটা আদতে সূর্য স্পর্শই করেনি! বরং সূর্যের বায়ুমণ্ডল স্পর্শ করেছে মাত্র। সূর্যের চারপাশে একটি পাতলা গ্যাসীয় স্তর আছে। ঠিক আমাদের পৃথিবীর মতো। এটাই সূর্যের বায়ুমণ্ডল। এই অঞ্চলটি করোনা দিয়ে আচ্ছাদিত, যেখানের উচ্চতাপের কারণে সূর্যের বায়ুমণ্ডলিও অংশটি প্লাজমাতে পরিণত হয়েছে। এখন এই প্লাজমা থাকার কারণে বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তরের পরিবৃত্তিতে তাপমাত্রা কয়েক মিলিয়ন পর্যন্ত হলেও

বাইরের তাপমাত্রা মাত্র ৫০০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস। আবার এই তাপমাত্রা সূর্যের বায়ুমণ্ডলের প্রায় ৩.৬ কোটি মাইল পর্যন্ত বিস্তৃত এবং কিছু স্থানে সর্বনিম্ন গভীরতা হলো প্রায় ৪ থেকে ৮.৫ মিলিয়ন কি.মি. পর্যন্ত। বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন অংশের তাপমাত্রা প্রায় ১০-৩০ মিলিয়ন ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত হয়।

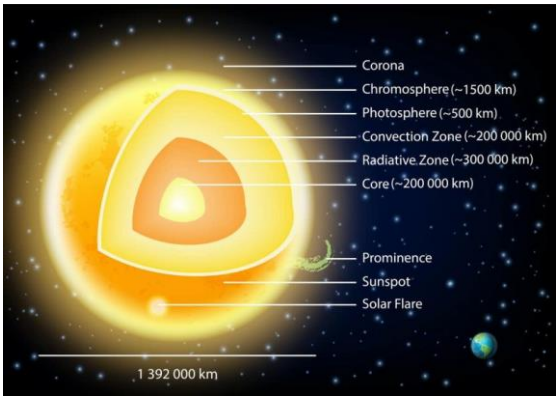

এখন আরেকটি প্রশ্ন হলো, এই যে মিলিয়ন মিলিয়ন তাপমাত্রাতেই বা কীভাবে সেটি টিকে থাকল? এটার কারণ হিসেবে দায়ী করা যায় তাপের চলন পদ্ধতিকে। তাপ চলে বিকিরণের মাধ্যমে। আবার এক্ষেত্রে আরেকটি বড় কারণ হলো প্রোবটির কাঠামো। প্রোবটি টাংস্টেন অ্যালয় দ্বারা গঠিত। আবার, আমরা জানি যে টাংস্টেনের মেল্টিং পয়েন্ট তথা গলনাঙ্ক প্রায় ৩৬০০ কেলভিন। তারপরও তাতে মলিবডেনামের সংকর টাইটানিয়াম-জারকোনিয়াম- মলিবডেনামসহ আরও উচ্চ তাপ সহ্যক্ষমতা সম্পন্ন মেটাল ব্যবহার করায় এর কাঠিন্য ও বহিরাবরণের গুণগত মান বেড়ে গেছে। আর তাছাড়া হিট শিল্ড তো আছেই। আবার পৃথিবীতে কার্বনের মেল্টিং পয়েন্ট (সাড়ে ৩০০০ এর ওপরে) সবচেয়ে বেশি হলেও ধাতুর মধ্যে কিন্তু টাংস্টেনই সর্বোচ্চ।

বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও গণিত নিয়ে আপনার লেখা ট্যাকিয়নে প্রকাশ করতে চান?

তাহলে আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন আমাদের কাছে ই-মেইলের মাধ্যমে।

ই-মেইল ঠিকানা : editortachyon@gmail.com

স্ট্যান্ডার্ড মডেলের ভবিষ্যৎ

মারুফ আহমেদ, শিক্ষার্থী
পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
নির্বাহী পরিচালক, কমিউনিটি অব ফিজিক্স

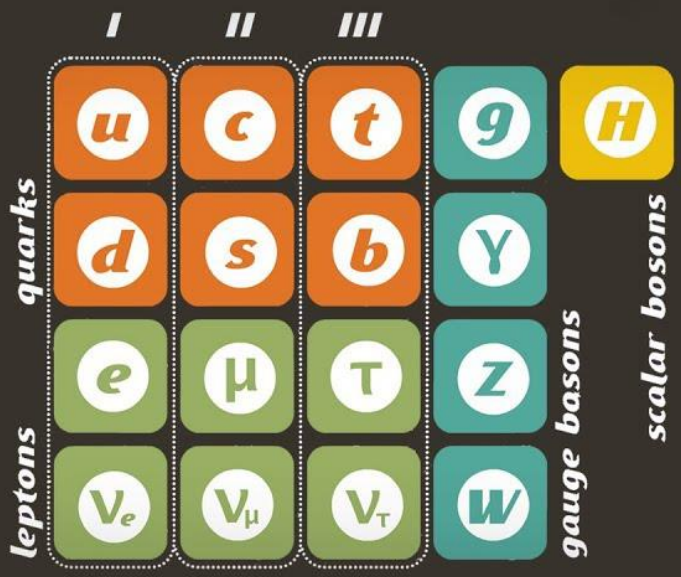

গত ৭ এপ্রিল ডব্লিউ বোসন-এর ভর পরিমাপ নিয়ে সিডিএফ (কোলাইডার ডিটেক্টর এট ফারমিল্যাব) কোলাবোরেশনের একটি গবেষণাপত্র প্রকাশের পর স্ট্যান্ডার্ড মডেল আরও একবার আলোচনায় এল। প্রতিবার এরকম ফলাফল প্রকাশ করলেই স্ট্যান্ডার্ড মডেল নিয়ে আলোড়ন ওঠে, জন্ম হয় নতুন আলোচনা আর বিতর্কের। আজ এই আর্টিকেলে আমরা কথা বলব, এই ফলাফলের অর্থ ও নতুনত্ব কী আর এতে স্ট্যান্ডার্ড মডেলের জন্য কী ভবিষ্যৎ লুকিয়ে আছে তা নিয়ে।

প্রথমেই ডব্লিউ বোসনের সাথে একটু পরিচিত হয়ে আসা যাক। স্ট্যান্ডার্ড মডেলে দুই ধরনের মৌলিক কণার অস্তিত্ব আছে; ফার্মিওন আর বোসন। নাম থেকেই স্পষ্ট যে ডব্লিউ বোসন দ্বিতীয় ধরনের মধ্যে পড়ে। এর দ্বারা দুইটি বিষয় বোঝা যায়:

এক. অন্যান্য সকল বোসনের মতো ডব্লিউ বোসনও বোস-আইনস্টাইন পরিসংখ্যান মেনে চলে,

দুই. এর স্পিন এক, যেটা একটা পূর্ণসংখ্যা। এছাড়াও ডব্লিউ বোসনের চার্জ ধনাত্মক অথবা ঋণাত্মক হয় (W+, W- - একটি অপরটির প্রতিকণা) এবং চার্জের একটি ইলেকট্রনের চার্জের মানের সমান। এদের উভয়ের সাথেই চৌম্বক মোমেন্ট জড়িত। এই দুটি বোসনের সঙ্গে জেড বোসন (Z0) নামে চার্জ ও চৌম্বক মোমেন্টবিহীন একটি কণার নামও উঠে আসে। এই তিনটি কণা একসাথে স্ট্যান্ডার্ড মডেলে ইন্টারমিডিয়েট ভেক্টর বোসন নামে পরিচিত।

তিনটি ভেক্টর বোসন কণাই অত্যন্ত ভারী, তবে জেড বোসন তুলনামূলকভাবে ডব্লিউ বোসনের চেয়ে আরেকটু বেশি ভরসম্পন্ন। একটু ধারণা দেয়ার জন্য বলি, ভেক্টর বোসনগুলো প্রোটনের চেয়ে প্রায় আশি গুণ ভারী। হিসেব করলে মৌলিক কণা হওয়া সত্ত্বেও এরা লোহার গোটা পরমাণুর চেয়েও ভারী। এরা মূলত দুর্বল নিউক্লিয়ার বলের বাহক। এই কণাগুলো কীভাবে ভরসম্পন্ন হলো, সেটা কণা পদার্থবিজ্ঞানের দীর্ঘ অমীমাংসিত রহস্যগুলোর একটি ছিল। অবশেষে ১৯৬৪ সালে ফিজিকাল রিভিউ লেটার্স এ তিনটি দল পৃথকভাবে হিগস মেকানিজম আবিষ্কার করলে এই রহস্য মীমাংসিত হয়, অন্ততপক্ষে তখন পর্যন্ত তাই ধারণা ছিল! হিগস মেকানিজম থেকে এখন আমরা জানি, প্রকৃতিতে SU(2) নামে প্রতিসমতা ভাঙার ঘটনা থেকেই ভেক্টর বোসনগুলোর এই উচ্চ ভরের উদ্ভব। এমনকি হিগস বোসনের আবিষ্কারের সাথেও এদের ভরের গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক আছে। হিগস

বোসনের আবিষ্কারের পর স্ট্যান্ডার্ড মডেল 'পূর্ণতা' পায়। এখন আমরা জানি, বিভিন্ন পদার্থ কণা কীভাবে হিগস ফিল্ড এর সাথে মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে ভর লাভ করে। অনেক আগে থেকেই এসব কণার ভর পরিমাপের চেষ্টা চলছে।

সিডিএফ কোলাবোরেশনের এই ডব্লিউ বোসনের ভর পরিমাপ কিন্তু প্রথম পরিমাপ নয়। এমনকি সিডিএফ এর জন্যও এটা প্রথমবার নয়, দ্বিতীয়। আরও ভালোভাবে বলতে গেলে, এটা নতুন কোনো পরীক্ষার মাধ্যমে পাওয়া ডেটা থেকেও নয়। যে পরীক্ষা থেকে এই ডেটা পাওয়া গিয়েছিল, তার নাম টেভাট্রন। টেভাট্রন যুক্তরাষ্ট্রে অবস্থিত ফারমিল্যাবেরই একটি পারটিকেল কলাইডার, যেখানে তীব্র শক্তিতে প্রোটন আর এর প্রতিকণা অ্যান্টিপ্রোটনের সংঘর্ষ ঘটানো হলো। এ শক্তি বাড়াতে বাড়াতে প্রায় ১ টেরা ইলেকট্রন ভোল্ট এ উন্নীত করা যেত, যেখান থেকে দেয়া হয়েছিল টেভাট্রনের নাম। ইউরোপিয়ান অর্গানাইজেশন ফর নিউক্লিয়ার রিসার্চ (সংক্ষেপে সার্ন) -এর অধীনে লার্জ হ্যাড্রন কোলাইডার (এলএইচসি) নির্মিত হবার আগে টেভাট্রনই ছিল বিশ্বের বৃহত্তম পার্টিকেল কলাইডার। ৬.২৮ কি.মি. পরিসীমার এই বৃত্তাকার কলাইডারটি কাজ করে ১৯৮৩ থেকে ২০১১

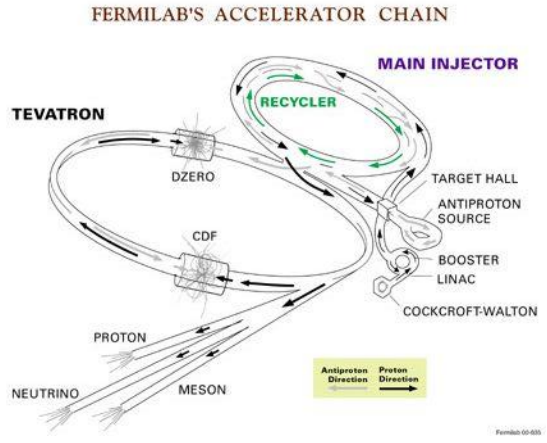

পর্যন্ত। এলএইচসি নির্মাণের পর অর্থের অভাবে এই এক্সপেরিমেন্টটি বন্ধ করে দেয়া হয়।

কাজেই যে পেপারটি নিয়ে এত হইচই, তার সর্বশেষ ডেটা সংগ্রহ শেষ হয়ে যায় এক দশকের বেশি সময় আগেই। তাহলে এই নতুন ফলাফলটি কী নিয়ে? পুরনো ডেটার নতুন ধরনের বিশ্লেষণ এই পেপারের বিষয়বস্তু। এই বিশ্লেষণটি গুরুত্বপূর্ণ কেন? একটা বড় কারণ হচ্ছে এর অবিশ্বাস্য ছোট্ট এরর মার্জিন, মানে ভুলের মাত্রা। পদার্থবিজ্ঞানের সকল পরিমাপকেই তার ভুলের মাত্রার ভিত্তিতে মাপা হয়। শতকরা শতভাগ নিখুঁত কোনো পরিমাপ করা কারও পক্ষেই সম্ভব না। ভুলের মাত্রাকে অন্য কথায় গ্রহণযোগ্যতার মাত্রাও বলা চলে। এর পূর্ববর্তী পরিমাপগুলোর তাকালে সর্বশেষ পরিমাপের বিশেষত্ব সহজেই চোখে পড়ে।

এই পরিমাপে ভুলের মাত্রা মাত্র ৯ মেগা ইলেক্ট্রন ভোল্ট, যেখানে এর আগে সকল ফলাফলে ভুলের মাত্রা ছিল কমপক্ষে ২০ মেগা ইলেক্ট্রন ভোল্ট! এটা একটা বিশেষ ঘটনা, কারণ এর আগে ডব্লিউ বোসনের নিকটাত্মীয় জেড বোসনের পরিমাপে ভুলের মাত্রা মাত্র ২ মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট এবং সকল বিবেচনাতেই এই দু -ধরনের বোসনের ভর পরিমাপের পার্থক্য ছিল চোখে পড়ার মতো। এই প্রথম ডব্লিউ বোসনের ক্ষেত্রে ভুলের মাত্রা এতটা কমিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে। এখন স্বল্প ভুলের মাত্রার মানে এই পরিমাপের নির্ভরযোগ্যতা ও গ্রহণযোগ্যতা বেশি। কিন্তু পরিমাপটা কী বলে? দেখা যাচ্ছে, ডব্লিউ বোসনের ভর পরিমাপে তত্ত্বীয় ভবিষ্যদ্‌বাণী আর গ্রহণযোগ্য পরিমাপের মধ্যে প্রায় ৭৬.৫ মেগা ইলেকট্রন ভোল্ট পার্থক্য। এত উচ্চপার্থক্য কোনোভাবেই শুধুমাত্র স্ট্যান্ডার্ড মডেলের অধীনে ব্যাখ্যা করা সম্ভব নয়।

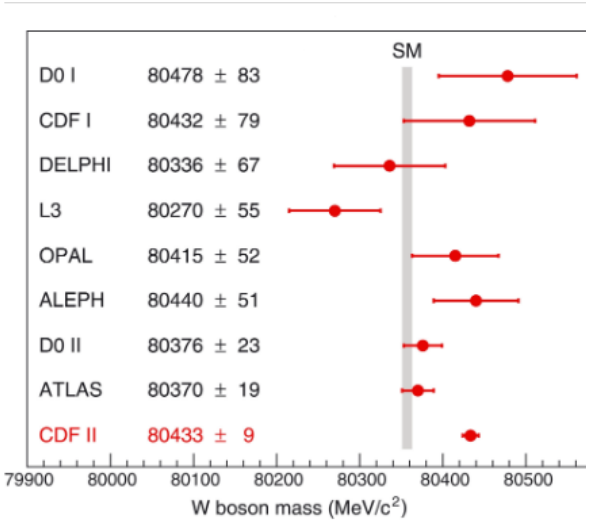

Fig. 5. Comparison of this CDF II measurement and past M_W measurements with the SM expectation. The latter includes the published estimates of the uncertainty (4 MeV) due to missing higher-order quantum corrections, as well as the uncertainty (4 MeV) from other global measurements used as input to the calculation, such as m_t. c, speed of light in a vacuum.

একটা বিষয় এখানে বেশ চোখে পড়ার মতো, সেটা হচ্ছে ভেক্টর বোসনগুলোর এই অত্যধিক ভর কীভাবে পরিমাপ করা হলো? কেননা একে তো এদের গড় আয়ু এক সেকেন্ডের ১০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০০ (২৫টি শূন্য এখানে আছে!) ভাগের প্রায় তিন ভাগের মতো। আলোর বেগে চললেও এই সময়ে একটা ডব্লিউ বোসন একটা প্রোটনের ব্যাসের দশভাগের একভাগও যেতে পারে না। তার আগেই এটা ভেঙে পড়ে অন্যান্য কণা ও প্রতিকণায় (হয় কোয়ার্ক + এন্টিকোয়ার্ক কণায় ভেঙে পড়ে অথবা লেপ্টন+নিউট্রিনো কণায়)। তারপর কেবল ভর ও শক্তি সংরক্ষণের নীতি প্রয়োগ করে এদের ভর পাওয়া যায়। এভাবে সকল অস্থিতিশীল কণারই ভর নির্ধারণ করা হয়।

এই ফলাফলের অনেক প্রভাব থাকতে পারে, তবে তার আগে এই ফলাফলকে স্বাধীনভাবে একাধিক উৎস থেকে স্বীকৃত হতে হবে, মানে অন্যান্য পরীক্ষণের ফলাফল দ্বারাও সমর্থিত হতে হবে। অনেক সময়ই দেখা যায়, এরকম অনিয়ম আরও সূক্ষ্ম ফলাফলে নাকচ হয়ে যায়। যদি সত্যিই এই ফলাফল গ্রহণযোগ্য হয়ে থাকে, তাহলে স্ট্যান্ডার্ড মডেলে এটাই সবচেয়ে বড় ঝামেলা হবে। এর অর্থ হচ্ছে অতিরিক্ত বলবাহক কণা আছে অথবা কোয়ার্ক আছে যার উৎস সম্পর্কে আমরা এখনও অবগত নই। এর আগে এলএইচসিতে প্রস্তাবিত এক ধরনের সুপার সিমেট্রির অস্তিত্ব পাওয়া যায়নি, তবে এক্ষেত্রে নতুন কণাকে নতুন স্ট্যান্ডার্ড মডেলে বসাতে গেলে সুপার সিমেট্রির প্রয়োজন হতে পারে। এই ফলাফল এলএইচসি এর এটলাস পরীক্ষণের সাথেও অসংগতিপূর্ণ। যদি এই পরীক্ষণ সঠিক হয়, তাহলে আগের অনেক বড়ো ফলাফলগুলোও নতুন করে বিবেচনায় আনতে হবে!

এবার আসা যাক, এই ফলাফলে স্ট্যান্ডার্ড মডেল এর কি শেষ অধ্যায় রচনা হয়ে গেল? উত্তর দেয়াটা একটু জটিল। তবে মোটাদাগে উত্তর হচ্ছে, না। এর আগে আমাদের বুঝতে হবে, স্ট্যান্ডার্ড মডেল আসলে কী? এর অন্তর্ভূক্ত যে কণার সমারোহ আছে, এরা কারা? কোথা থেকে এল এরা? চলুন, একটু পেছাই।

স্ট্যান্ডার্ড মডেল আসলে দেখতে রসায়নের পর্যায় সারণির মতো। সে হিসেবে একে কণা পদার্থবিজ্ঞানের পর্যায় সারণি বলা যায়। আগেই বলা হয়েছে, এর মধ্যে প্রধান ভাগ দুটি; ফারমিওন ও বোসন। ফারমিওনেরা কণাতত্ত্বের ফারমি-ডিরাক পরিসংখ্যান মেনে চলে। স্ট্যান্ডার্ড মডেলে যে ফারমিওনগুলো আছে, তারা আরও দুটো ভাগে ভাগ হয়। এদের একটা দলকে বলা হয় কোয়ার্ক, আরেক দলকে বলা হয় লেপ্টন। কোয়ার্ক আছে ছয়টি (আপ, ডাউন, চার্ম, স্ট্রেঞ্জ, টপ, বটম), যারা আসলে সব পদার্থ গঠনের মূলে আছে। যেমন প্রোটন ও নিউট্রনসহ সকল হ্যাড্রন, মেসন ইত্যাদি গঠিত হয় কোয়ার্ক দ্বারা। প্রকৃতিতে কখনও এদের মুক্তভাবে পাওয়া যায় না, তবে লেপ্টনরা মুক্তভাবে থাকতে পারে। লেপ্টন দলের মধ্যে আছে আবার দুটি ভাগ, ইলেক্ট্রন দল এবং নিউট্রিনো দল। ইলেকট্রন দলে আছে ইলেকট্রন, মিউওন এবং টাও। আর নিউট্রিনো দলে আছে ইলেকট্রন নিউট্রিনো, মিউওন নিউট্রিনো এবং টাও নিউট্রিনো। এই অংশটুকু মনে রাখা জরুরি, কারণ স্ট্যান্ডার্ড মডেলের এর কার্যকারিতা আলোচনায় এরা অবধারিতভাবে চলে আসবে।

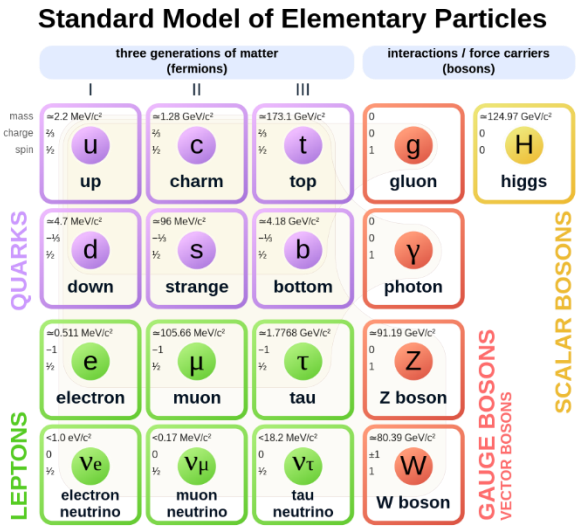

অন্যদিকে বোসনরা পদার্থ গঠনে তেমন একটা ইচ্ছুক নয়, এরা মূলত বল বহনকারী কণা। যেমন, মোটামুটি সবাই জানে যে, ফোটন কণা তড়িৎচৌম্বকীয় বলের জন্য দায়ী। একইভাবে, ডব্লিউ ও জেড বোসনগুলো দুর্বল নিউক্লিও বলের আদান-প্রদানের জন্য এবং গ্লুওন সবল নিউক্লিও বলের আদান-প্রদানের জন্য দায়ী। এই কণাগুলোই সমন্বিতভাবে ভেক্টর বোসন নামে পরিচিত। এদের স্পিন ১, অন্যদিকে হিগস কণাকে বলা হয় স্কেলার বোসন, যার স্পিন ০ (শূন্য)। এই নিবন্ধটি যখন লেখা হচ্ছে, এরা সবাই ইতোমধ্যে পরীক্ষামূলকভাবে আবিষ্কৃত হয়ে গেছে। লক্ষ করলে দেখা যাবে, চারটি মৌলিক বলের একটি হচ্ছে মহাকর্ষ, যার কথা এখানে বলা হয়নি। আসলে ইচ্ছে করেই মহাকর্ষীয় বল বাহক কণার কথা এখানে বলা হয়নি, সাধারণত স্ট্যান্ডার্ড মডেলে দেখাও যায় না। তবে ধারণা করা হয়, গ্র্যাভিটন নামে এক স্পিন -২ কণার মাধ্যমে মহাকর্ষ বল কার্যকর হয়, তবে এই ধারণার কোনো পরীক্ষামূলক ভিত্তি আজ পর্যন্ত পাওয়া যায়নি।

গ্র্যাভিটনের ব্যাপারটা বাদ দিলে, এই পর্যন্ত আপাতদৃষ্টিতে স্ট্যান্ডার্ড মডেলের সব ঠিকঠাক আছে বলেই মনে হয়। তবে এর মাঝেও বেশ কিছু 'কিন্তু ...' আছে, যেগুলোর কোনোটার সমাধান হয়েছে, কোনোটার নিকট ভবিষ্যতে সমাধান পাওয়ার সম্ভাবনা আছে, আর কোনোটা একেবারেই সম্ভাবনার বাইরে। সমাধান হয়েছে এমন একটা বিখ্যাত সমস্যা হচ্ছে নিউট্রিনোর ভর। লম্বা একটা সময় ধরে ধারণা করা হতো, নিউট্রিনো আসলে একটা ভরহীন কণা। কিন্তু নিউট্রিনো স্পন্দন (এটাও স্ট্যান্ডার্ড মডেলের ভবিষ্যদ্বাণীর বাইরে ছিল) আবিষ্কারের ফলে আমরা জানতে পারি, খুবই স্বল্প পরিমাণে হলেও নিউট্রিনোর ভর আছে। পরবর্তীতে নিউট্রিনোর ভর ব্যাখ্যা করার জন্য স্ট্যান্ডার্ড মডেলকে পরিবর্তিত করা হয়। তার মানে সমাধানের চেয়ে বরং স্ট্যান্ডার্ড মডেলকে অনেকটা জোর করে ঠিক করার মতোই ব্যাপারটা। সমাধান হয়নি এরকম অনেক সমস্যাগুলোর মধ্যে একটা হচ্ছে, কণা-প্রতিকণার অসমতা। বিগব্যাং এর ফলে তো কণা-প্রতিকণা সমান সমান মাত্রায় উৎপন্ন হওয়ার কথা। কিন্তু কেন আমরা শুধুমাত্র কণাই দেখতে পাই? এছাড়াও আছে, ডার্ক ম্যাটারের ব্যাখ্যার অভাব বা মহাবিশ্বের ত্বরণের ব্যাখ্যার অভাবের মতো গুরুত্বপূর্ণ সমস্যাসমূহ।

মোদ্দাকথা হচ্ছে এই যে, স্ট্যান্ডার্ড মডেল নিজস্ব গণ্ডির বেশ কিছু জায়গায় অত্যন্ত চমৎকার সাফল্য দেখালেও, তার নিজস্ব অনেক সীমাবদ্ধতাও রয়েছে এবং কম-বেশি সবাই স্বীকার করে, স্ট্যান্ডার্ড মডেলই শেষ কথা নয়। বরং, যে সমস্যাগুলো ওপরে উল্লেখ করা হলো, সেগুলো নিয়ে কাজ করতে গেলে অনেক সময়ই এমন গণ্ডিতে আমাদের পা রাখতে হয়, যেটা স্ট্যান্ডার্ড মডেলের বাইরে। এমন অনেক ভিন্ন ধরনের মডেল তৈরির কাজ চলছে, যারা একদিকে যেমন স্ট্যান্ডার্ড মডেলের সাফল্যগুলোকেও অক্ষত রাখবে, তেমনি ব্যর্থতাগুলোরও যথাযথ ব্যাখ্যা দিতে পারবে। কিন্তু তাতে কি স্ট্যান্ডার্ড মডেলকে ব্যর্থ বলা যাবে?

উত্তর দেয়াটা কঠিন, কিন্তু মোটাদাগে, না। আমরা যারা পদার্থবিজ্ঞানের জটিল বিষয়গুলো বুঝতে চাই, এই কথাটা মনে রাখা জরুরি। সাধারণত পদার্থবিজ্ঞানের সকল তত্ত্বই কোনো একটা 'স্কেলে' সত্যি। 'সত্যি' কথাটার মানে হচ্ছে, ওই তত্ত্ব এবং পরীক্ষালব্ধ ফলের মাঝে যে মিল দেখা যায়, তা অন্য কোনো তত্ত্বের দ্বারা সম্ভব নয়। যেমন নিউটনের গতিসূত্র অতি উচ্চগতি, অতি উচ্চভর এবং আণবিক স্কেলে খাটে না, তাছাড়া সত্যি। এই 'স্কেলের' বাইরে সাধারণত ওই তত্ত্বের ভবিষ্যদ্বাণী এবং সত্যিকার পরীক্ষালব্ধ ফলাফলের ভেতর

উল্লেখযোগ্য পার্থক্য দেখা দিতে থাকে, অন্য কথায়, ভেঙে পড়তে থাকে। তাতে কি ওই তত্ত্বকে ফেইলিউর বলা যাবে? যেমন এখন আমাদের জ্ঞানের রাজ্যে কোয়ান্টাম তত্ত্ব এবং আপেক্ষিকতা আছে বলে আমরা নিউটনের গতিসূত্র কি বিলুপ্ত করে দেয়া উচিত হবে? উত্তর হলো, অবশ্যই না। কোয়ান্টাম তত্ত্ব এবং আপেক্ষিকতা উভয়েই নির্দিষ্ট শর্তে নিউটনের সূত্র পুনরুৎপাদন করে, সেহেতু ওইসব শর্তাধীনে কোনো সমস্যার সমাধান কিন্তু কেউই আপেক্ষিকতা বা কোয়ান্টাম তত্ত্ব ব্যবহার করে করতে যায় না। যদি করেও, তাহলে যে বিশেষ শুদ্ধতা অর্জন করা যায়, সেটাও হিসাবের জটিলতার তুলনায় খুবই উপেক্ষণীয়। একইভাবে হয়তো আমরা কণাতত্ত্বের পরবর্তী আরও উচ্চতর বা সাধারণ তত্ত্বের দিকে যাচ্ছি, যেটাকে কণা পদার্থবিদরা নাম দিয়েছেন, বিয়ন্ড স্ট্যান্ডার্ড মডেল। তাতে আরও যেসব নতুন ঘটনা স্ট্যান্ডার্ড মডেল ব্যাখ্যা করে না তাদের ব্যাখ্যা আসবে। কিন্তু স্ট্যান্ডার্ড মডেলের যে অবদান, সেটাকেও নিশ্চিত করেই নতুন তত্ত্বগুলোকে এগিয়ে যেতে হবে।

রেফারেন্স :

১। CDF Collaboration et. al.; High-precision measurement of the W boson mass with the CDF II detector; SCIENCE Volume 376 | Issue 6589 | 8 April 2022; DOI: 10.1126/science.abk1781

২। Chris Quigg; Gauge Theories of the Strong, Weak, and Electromagnetic Interactions; Princeton University Press, 2nd edition

গাণিতিক রিলেশনশিপ

পার্থ পাল,
শিক্ষার্থী, নাগেশ্বরী ডি. এম. একাডেমী
কলাম লেখক, প্রথম আলো গণিত ইশকুল

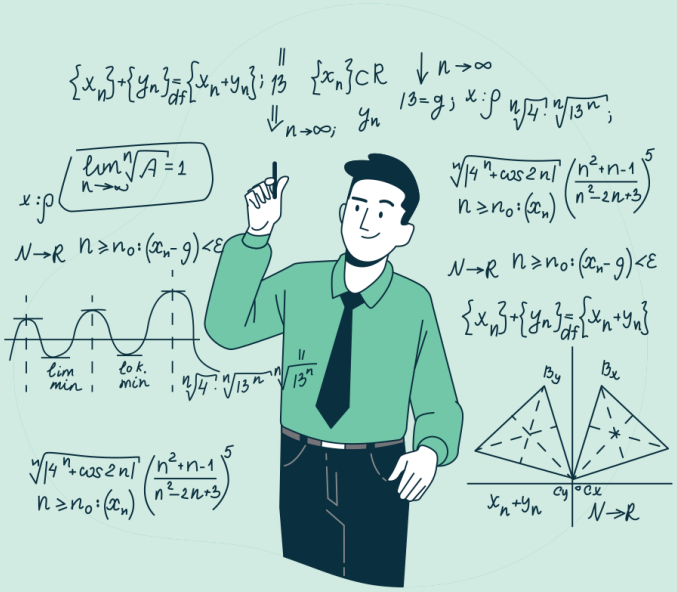

রিলেশনশিপ যে শুধুমাত্র মানুষ বা প্রাণীদের মধ্যেই স্থিতিশীল রয়েছে, এমনটা নয়। সম্পর্ক রয়েছে মহাবিশ্বের প্রতিটি ক্ষুদ্র জিনিস থেকে বৃহৎ জিনিসের মধ্যে। এমনকি সম্পর্কের এই বন্ধন থেকে বাদ যায়নি গণিতও। যেমন, একটি সুন্দর গাণিতিক অনুপাত, 'সোনালি অনুপাত' বা 'গোল্ডেন রেশিও' যা এই মহাবিশ্বের প্রতিটি সুন্দর জিনিসকে একটি সম্পর্কের বন্ধনে আবদ্ধ করেছে। আপনি যদি আরও ভালোভাবে লক্ষ্য করেন, তাহলে দেখতে পাবেন গণিতের সকল সমীকরণের মধ্যে রয়েছে একটি গাণিতিক সম্পর্ক যা দ্বারা বোঝায় ডানপক্ষ সমান বামপক্ষ। তো আজকের এই লেখায় গণিতের বিশেষ কয়েকটি টার্মের মধ্যকার সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করব।

ঘন সংখ্যা ও বর্গ সংখ্যার রিলেশনশিপ:

আপনারা অনেকের হয়তো জানেন না যে, পাঠ্যবইয়ের বিভিন্ন সূত্র ছাড়াও ঘন আর বর্গ এর মধ্যে রয়েছে আরও অদ্ভুত ও মজাদার এক সম্পর্ক। এই সম্পর্কের সাধারণ গঠন হলো:

$$1^3 + 2^3 + 3^3 + 4^3 + \ldots + n^3 = (1 + 2 + 3 + 4 + \ldots n)^2$$

উদাহরণ:

$$1^3 = 1^2$$

$$1^3 + 2^3 = (1 + 2)^2$$

$$1^3 + 2^3 + 3^3 = (1 + 2 + 3)^2$$

$$1^3 + 2^3 + 3^3 + 4^3 = (1 + 2 + 3 + 4)^2$$

$$1^3 + 2^3 + 3^3 + 4^3 + 5^3 = (1 + 2 + 3 + 4 + 5)^2$$

$$1^3 + 2^3 + 3^3 + 4^3 + 5^3 + 6^3 = (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6)^2$$

এভাবে অসীম পর্যন্ত চলতে থাকবে। এর কোনো শেষ নেই। বিশ্বাস না হলে নিজেই করে দেখতে পারো। আর হ্যাঁ, এই সম্পর্কটাকে চমৎকারভাবে প্রমাণ করা যায় 'ইন্ডাকশন' বা 'গাণিতিক আরোহ' পদ্ধতির সাহায্যে। সেই প্রমাণটা এখানে আলোচনা করব না, সেটা আপনাদের ওপরে ছেড়ে দিলাম।

এবার আসা যাক দ্বিতীয় গাণিতিক সম্পর্কে।

বিজোড় সংখ্যা ও বর্গ সংখ্যার রিলেশনশিপ:

বিজোড় সংখ্যা ও বর্গ সংখ্যার মধ্যে একটি অসাধারণ মিল রয়েছে, যেটি সম্পর্কে আমরা অনেকেই হয়তো অবগত নই। সম্পর্কটা এরকম যে, প্রথম দুইটি বিজোড় সংখ্যার যোগফল 2 এর বর্গের সমান, আবার প্রথম তিনটি বিজোড় সংখ্যার যোগফল 3 এর বর্গের সমান। এরকমভাবে প্রথম nটি বিজোড় সংখ্যার যোগফল n এর বর্গের সমান। এই সম্পর্কের সাধারণ গঠন হলো:

$1 + 3 + 5 + \ldots + (2n - 1) = n^2$

উদাহরণ:

$$1 = 1^2$$

$$1 + 3 = 2^2$$

$$1 + 3 + 5 = 3^2$$

$$1 + 3 + 5 + 7 = 4^2$$

$$1 + 3 + 5 + 7 + 9 = 5^2$$

$$1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11 = 6^2$$

এটিও এভাবে চলতে থাকবে অসীম পর্যন্ত। এই সম্পর্কটাকে দুটি চমৎকার উপায় প্রমাণ করা যায়। একটি হচ্ছে 'ইন্ডাকশন' বা 'গাণিতিক আরোহ' পদ্ধতির সাহায্যে, আরেকটি হচ্ছে আমাদের ছোটবেলায় শিখে আসা সমান্তর ধারা ব্যবহার করে। তো, দুটি উপায়েই আপনারা এই সম্পর্কটাকে প্রমাণ করার চেষ্টা করতে পারেন।

আপনারাও খুঁজতে থাকুন গণিতের বিভিন্ন টার্মের অভ্যন্তরীণ সম্পর্ক কিংবা তৈরি করতে পারেন গণিতের সঙ্গে আপনার রিলেশনশিপ এবং হয়ে যেতে পারেন একজন গণিতপ্রেমী। তো সবাইকে গাণিতিক শুভেচ্ছা জানিয়ে আজ এখানেই শেষ করছি।

ডেটা সায়েন্স ও বাংলাদেশ

আজমাইন তৌসিক ওয়াসি,
শিক্ষার্থী, শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়

বর্তমানে 'ডেটা সায়েন্স' একটা বাজওয়ার্ড। আমরা সবাই কমবেশি চারদিকে এর কথা শুনেছি, এ দিয়ে অসাধ্য সাধন করার কথা শুনেছি। সামনের দুনিয়া ডেটা সায়েন্স ছাড়া চলবে না— এমনটা ঘোষণাও দিয়ে দিয়েছেন অনেকে!

ডেটা সায়েন্স কী?

ডেটা সায়েন্স কী এ নিয়ে কোনো সুস্পষ্ট সংজ্ঞা দেয়া কঠিন। ডেটা সায়েন্স হলো, বিজ্ঞানের এমন একটা ক্ষেত্র, যেখানে নানারকম বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি, অ্যালগরিদম ও সফটওয়্যার ব্যবহার করে বিভিন্ন ডেটা সিস্টেম হতে নানারকম তথ্য সংগ্রহ, ভিজ্যুয়ালাইজ, মডেলিং ও বিশ্লেষণ করে ডেটা থেকে নানারকম ইনসাইট বের করা হয়, যা পরবর্তীতে গবেষণা বা ব্যবসায়িক কাজে ব্যবহার করা হয়।

এক কথায় বললে, ডেটাকে কাজে লাগানোর বিজ্ঞানই হলো ডেটা সায়েন্স। ডেটা সায়েন্স ডেটা থেকে ডেটার বিভিন্ন অদেখা রূপ আমাদের সামনে তুলে ধরে। আমাদেরকে বিভিন্ন ব্যক্তিগত, ব্যবসায়িক কিংবা বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে। উদাহরণ হিসেবে বলতে পারি, গুগল ম্যাপে আমরা কোথায় কতটুকু জ্যাম আছে তা দেখতে পাই, কোথায় যেতে কতটুকু সময় লাগবে তা দেখতে পাই। নেটফ্লিক্সে গেলে সে আমাদেরকে আমরা যেরকম মুভি বা সিরিজ দেখতে পছন্দ করি, সেগুলোই দেখায়; ইউটিউবও আমাদের আগের দেখা ভিডিওর উপর ভিত্তি করে নতুন নতুন ভিডিয়ো রিকমেন্ড করে। বিদেশে আমরা দেখি, রাস্তার মোড়ে লাগানো সিসি ক্যামেরা ট্রাফিক ভায়োলেশন ধরে ফেলে অটোমেটিক জরিমানা করে দেয়। এরকম সবকিছুতেই ডেটা সায়েন্সের হাত রয়েছে।

বাংলাদেশে ডেটা সায়েন্স-এর শুরু ও বিকাশ

বিশ্বের অন্যান্য দেশ থেকে বেশ পিছিয়ে থাকলেও বাংলাদেশে কয়েক বছর আগে থেকেই এর চলন শুরু হয়েছে। প্রথমে সবার শুরুটা হয় বিভিন্ন অনলাইন কোর্সের মাধ্যমে। কোর্সেরা, উডেমি, ইউটিউবসহ বিভিন্ন প্লাটফর্মে অনলাইন কোর্সের মাধ্যমে বাংলাদেশে এর যাত্রা শুরু। পরবর্তীতে কোভিড-১৯ এর লকডাউনে এর গতি আরও বাড়ে। যার ফলাফল আমরা দেখতে পাই,

ডেটা সায়েন্স-মেশিন লার্নিং কমিউনিটি ক্যাগলে বাংলাদেশিদের ভালো অবস্থান থেকে।

মোবাসশির হোসেন বাংলাদেশ থেকে সর্বপ্রথম ক্যাগল গ্র্যান্ডমাস্টার হন নোটবুকস সেকশনে; পরবর্তীতে তিনি ডিসকাশনেও গ্র্যান্ডমাস্টার হন। তিনি ঢাকা ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি থেকে সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ারিং নিয়ে পড়াশোনা করেন এবং বর্তমানে কম্পিউটার ভিশন ও ন্যাচারাল ল্যাঙ্গুয়েজ প্রসেসিং নিয়ে কাজ করছেন।

বাংলাদেশের আরেকজন ক্যাগল গ্র্যান্ডমাস্টার হলেন বুয়েট ইইই থেকে মোঃ আওসাফুর রহমান। তিনিও নোটবুকস গ্র্যান্ডমাস্টার এবং এ সেকশনে গ্লোবাল র‍্যাংকিংয়ে এখন ৫ নম্বরে আছেন। পাশাপাশি, তিনি Weights & Biases -এ ডেভ এক্সপার্ট হিসেবে কর্মরত আছেন। এছাড়াও বিভিন্ন সেকশনে ক্যাগল মাস্টার ও এক্সপার্ট হিসেবে আছেন আরও অনেকেই।
বাংলাদেশে ডেটা সায়েন্স নিয়ে হায়ার স্টাডির চান্স ক'দিন আগেও ছিল না। তবে অনেকেই বিশ্বের বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি থেকে ডেটা সায়েন্সে মাস্টার্স ও পিএইচডি করেছেন ও করছেন।

সম্প্রতি ইউনাইটেড ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ, ডেটা সায়েন্সে মাস্টার্স প্রোগ্রাম চালু করেছে এবং আরও নামিদামি কিছু বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ডেটা সায়েন্স মাস্টার্স প্রোগ্রাম চালু হবার কথা চলছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এপ্লাইড স্ট্যাটিসটিক্স ইন্সটিটিউটেও এ সংক্রান্ত পড়াশোনার সুযোগ আছে। পাশাপাশি, বাংলাদেশি বিভিন্ন এডুটেক প্রতিষ্ঠানও বাংলায় ডেটা সায়েন্স-মেশিন লার্নিংয়ের উপর কোর্স চালু করেছে; ব্যক্তি পর্যায়েও বিভিন্ন রকম ট্রেনিং-সেমিনার-কোর্স চালু হয়েছে।

তবে অনেকেই এ ফিল্ডে আসলেও ভালোভাবে শিখছে খুব কমই, তাই এদিকেও নজর দিতে হবে আমাদের। হুজুগের বসে আসলে ভবিষ্যত উজ্জ্বল হওয়ার বদলে অন্ধকার হবার সম্ভাবনাই বেশি।

জব সিচ্যুয়েশন ও ফিউচার

বাংলাদেশে সম্প্রতি ডেটা সায়েন্স সম্পর্কিত চাকরির পরিমাণ বেশ বাড়ছে। বিভিন্ন নামিদামি কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান বিজনেস এনালিটিক্স সেকশন থেকে শুরু করে আর্টিফিশিয়াল ইন্টেলিজেন্স-এ ডেটা সায়েন্টিস্ট নিচ্ছে। তবে, কর্পোরেট জবের তুলনায় রিসার্চ এরিয়াতেই বাংলাদেশে বর্তমানে কাজের সুযোগ বেশি ডেটা সায়েন্সে। ICCDR, B-সহ আরও বেশ কিছু জায়গায় বায়োইনফরমেটিক্সসহ আরও নানা ফিল্ডে ডেটা সায়েন্স নিয়ে কাজ করার সুযোগ রয়েছে।

ACI লিমিটেড, দেশের কমিউনিকেশন জায়ান্টস (রবি, বাংলালিংক, গ্রামীনফোন)-সহ বেশ কিছু প্রতিষ্ঠান বিজনেস অ্যানালিটিক্স-এ মেশিন লার্নিং ও ডেটা সায়েন্স ব্যবহার করে। রবি ডাটাথন এর আয়োজন করছে সেরা ডাটা-স্টোরিটেলারদের খুঁজতে। সব মিলিয়ে এখানে এই সেক্টরটি বেশ দ্রুতই বিকশিত হচ্ছে, নতুন বিভিন্ন জায়ান্টস তাদের সংগৃহীত বিভিন্ন ডেটা প্রসেস ও বিজনেস এনালিটিক্স প্রেডিকশনের জন্য ডেটা সায়েন্টিস্ট এর শরণাপন্ন হচ্ছে। ফাইন্যান্স সেক্টরে শেয়ার বাজার, ক্রিপ্টোকারেন্সিসহ এরকম ফিল্ডে বর্তমানে ডেটা সায়েন্স আবশ্যক হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ডেটা সায়েন্স বেজড স্টার্টআপ ও ফিউচার

তবে ডেটা সায়েন্স ও মেশিন লার্নিং নিয়ে বাংলাদেশে সবচেয়ে মজার কাজ হচ্ছে নতুন স্টার্টআপগুলোতে। মেশিন লার্নিং বেজড বেশ কিছু স্টার্টআপ তৈরি হয়েছে বাংলাদেশে; আইওটি, বিজনেস, ফিনটেক, এডটেক, হেলথটেক-সহ বিভিন্ন ফিল্ডে! শুধু স্টার্টআপ শুরুই নয়, অনেকে ইতোমধ্যে বেশ ভালো ফান্ডিংও পেয়ে গেছে।

ডেটা সায়েন্স-মেশিন লার্নিং বেজড এরকম কিছু প্রতিষ্ঠান হলো Thrive (Ed-Tech এ, মেশিন লার্নিং ব্যবহার করে আরও ইফেক্টিভ ওয়েতে ভর্তি পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতে সাহায্য করে), Socia (NLP বেজড বিভিন্ন সেবা দিয়ে থাকে), Gaze Technology (কম্পিউটার ভিশন বেজড; সিসিটিভি থেকে অবজেক্ট ও টেক্সট ডিটেকশনসহ

এরকম বিভিন্ন সেবা দিয়ে থাকে), Cramstack (ডেটা ও ক্লাউড রিলেটেড সেবা), Light Technologies (স্কুল ম্যানেজমেন্ট), Hydroquo+ (পানি নিয়ে), Alice Labs (ই-কমার্স সেক্টরে অটোমেশন, কম খরচে আরও ভালো সার্ভিস দিতে সহযোগিতা দেয়) ইত্যাদি।

এভাবে কাজ করে স্বীকৃতিও পেয়েছেন অনেকেই। Forbes 30 Under 30-তে উঠে এসেছেন এমন অনেক ডেটা সায়েন্স-মেশিন লার্নিং বেজড স্টার্টআপ ফাউন্ডাররা। ২০২১ সালে Gaze, Cramstack, Hydroquo+ এবং ২০২২ সালে Bondstein Technologies, Alice Labs এর ফাউন্ডাররা। তাই, 'সঠিকভাবে এগোলে ভবিষ্যত উজ্জ্বল', বলাই যায়!

তাই নিজে নিজের আইডিয়া দিয়ে কোম্পানি গড়ে তোলা, স্বনামধন্য বিভিন্ন কোম্পানিতে চাকরি কিংবা গবেষণা করা, দেশের বাইরে হায়ার স্টাডিজ; সবদিকেই বেশ ভালো ভবিষ্যৎ আছে বলে আশা করা যাচ্ছে।

প্রতিদিন মানুষ গড়ে ২.৫ কুইন্টিলিয়ান বাইট ডেটা (২.৫×১০০০০০০০০০ জিবি) তৈরি করে। অবশ্যই এসব ডেটার অনেক বাস্তব প্রয়োগ আছে আর সেসবেরই সামনে পড়ছি আমরা প্রতিনিয়ত। ডেটার জালে আমরা সবাই বন্দি। আর ডেটার জালে বন্দি করতে প্রতিনিয়তই প্রয়োজন দক্ষ ডেটা সায়েন্টিস্ট। আর তাই দিনকে দিন এর চাহিদা বাড়ছেই।

ব্যাকটেরিয়া ও ইস্টের কথোপকথন

সানজিদা ইসলাম শেফা
শিক্ষার্থী, প্রমথনাথ বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, রাজশাহী।

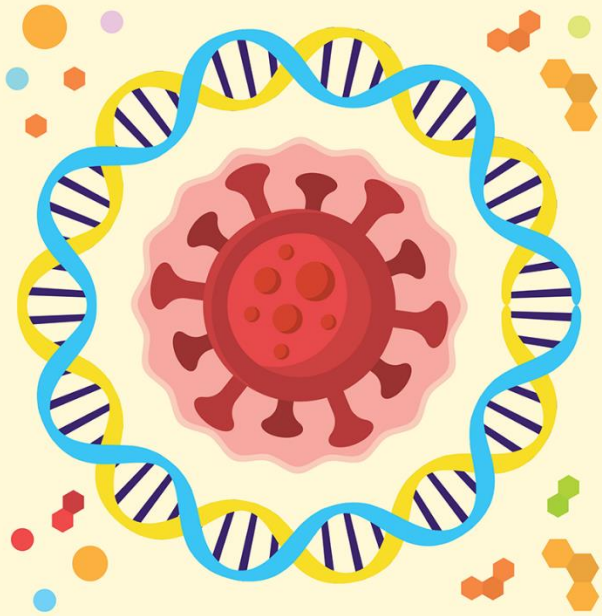

নিজ প্রয়োজনে, ভাব প্রকাশের জন্য কথোপকথনের গুরুত্ব কে না জানে! সম-প্রজাতির প্রাণীদের মধ্যে নিজেদের চাহিদা পূরণের জন্য, নিজেদের মাঝে যোগাযোগ রক্ষার সুবিধার্থে রয়েছে কথোপকথন এক বিশেষ প্রক্রিয়া। এই আলাপচারিতা হতে পারে ভাষায়, ইঙ্গিতে কিংবা কোষীয় সংকেত আদান-প্রদানের সমন্বয়ে। কিন্তু কথাবার্তা কি শুধু এক শ্রেণির প্রাণীকুল বা অনুজীবকুলেই সীমাবদ্ধ? এই যোগাযোগ কি শুধু একই রাজ্যভুক্ত (kingdom)? না কি এর সকল প্রাণীই পারে?

এক কথায় বলতে গেলে, ভিন্ন রাজ্যের মধ্যেও এই কথোপকথন চলতে পারে, যেমন: ব্যাকটেরিয়া এবং ইস্টের ক্ষেত্রে।

মানবজাতি একে-অপরের সাথে শব্দ তরঙ্গের সাহায্যে কথোপকথন করে যাকে আমরা আওয়াজ বলি।

প্রকৃতিতে প্রাণীর এবং উদ্ভিদের কোষসমূহ তাদের মধ্যে রাসায়নিক সংকেত আদান প্রদান করে কথোপকথন করে থাকে। তারা অভ্যন্তরীণ আলাপচারিতা চালায় রসায়নের ভাষায়। এই প্রক্রিয়া মূলত ব্যাকটেরিয়াদের তাদের আচরণ নিয়ন্ত্রণে, ফানজাইদের মিলিত হতে এবং মানবকোষকে বিভিন্ন ঝুঁকি সম্পর্কে অবহিত করতে ভূমিকা রাখে। এই ধরনের রাসায়নিক যোগাযোগ গবেষকদের তাদের নিজস্ব কৌশলের মাধ্যমে কোষীয় নির্দেশনা প্রদান করতে অনুপ্রাণিত করেছে। এক্ষেত্রে ভিন্ন রাজ্যের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবও নিজেদের মাঝে যোগাযোগ রক্ষা করতে পারে, যা বুঝতে আপাত দৃষ্টিতে আমাদের দুর্বোধ্য ঠেকবে। তবে তাদের এমন ভাষাগত আচরণের দিকটিকে নিয়ন্ত্রণ করেই গবেষকরা বিভিন্ন রোগের বিরুদ্ধে রক্ষার কৌশল বের করতে আশাবাদী। কিছু গবেষণায় মাইক্রো বা ন্যানো-স্কেল কণা পরীক্ষা করা হয়েছে, যেখানে দেখা গেছে একই ধরনের কোষের সাথে যোগাযোগ করে । তবে এক্ষেত্রে দুটি ভিন্ন ধরনের কোষের মধ্যে যোগাযোগ করতে সক্ষম কণার ব্যবহার এখনও আবিষ্কৃত হয়নি।

ACS-এর Nano Letters-এর একটি নতুন গবেষণায় গবেষকরা প্রথম সিস্টেমটি বর্ণনা করেছেন যা এমনি দুইটি নিঃসম্পর্ক জীবকে যোগাযোগ করাতে সক্ষম করে। গবেষকরা এমনি একটি ন্যানো-স্কেল অনুবাদক যন্ত্র তৈরি করতে চেয়েছিলেন যাতে তারা দুইটি ভিন্ন জীবের মধ্যে রাসায়নিক সংকেত পাঠাতে পারেন- যা আদতে প্রকৃতিতে খুব কমই ঘটে। দলটি মূলত দুইটি অণু দ্বারা পূর্ণ সিলিকা ন্যানো পার্টিকেল থেকে ন্যানো ট্রান্সলেটরটি তৈরি করেছে: যার একটি ফ্লিওমাইসিন নামক অণু এবং আরেকটি অণু যা গ্লুকোজের সাথে বিক্রিয়া করে। তারা যে সিগন্যালিং সিস্টেমটি তৈরি করেছিলেন তা মূলত দুটি ধাপে ছিল, যা তারা স্বাধীনভাবে পরীক্ষা করে তারপর একসাথে রেখেছিলেন।

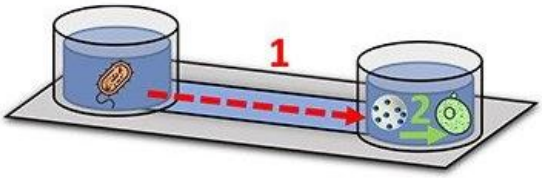

ডট বিশিষ্ট গোলকটি একটি ন্যানোট্রান্সলেটর। এটির সাহায্যে একটি ব্যাকটেরিয়া ও ইস্টের মাঝে রাসায়নিক কথোপকথন ঘটানো সম্ভব হয়েছে।

প্রথমে গবেষকরা E.coli -কে ল্যাকটোজ দ্রবণে উন্মুক্ত করে একটি সংকেত তৈরি করেছিলেন। উক্ত ব্যাকটেরিয়া ল্যাকটোজকে গ্লুকোজে রূপান্তরিত করেছিল, যা ন্যানো ট্রান্সলেটরের সাথে বিক্রিয়া করে। এরপর ডিভাইসটি সেই ফ্লিওমাইসিন নামক যৌগকে ত্যাগ করে। Saccharomyces cerevisiae নামক ইস্টটি ফ্লিওমাইসিনটিকে শনাক্ত করে এবং ফ্লোরোসেন্টের মাধ্যমে প্রতিক্রিয়া জানায়, যা করতেই মূলত তারা জিনগতভাবে গঠিত। গবেষকরা অনুরূপ ন্যানো ট্রান্সলেটর ভিত্তিক যোগাযোগ ব্যবস্থার জন্য অনেক সম্ভাব্য অ্যাপ্লিকেশন ইতোমধ্যেই কল্পনা করেছেন। উদাহরণস্বরূপ এই ডিভাইস কোষগুলোকে নির্দিষ্ট প্রক্রিয়াগুলো বন্ধ করতে এবং চালু করতে বা রোগের চিকিৎসার ক্ষেত্রে মানুষের ইমিউন কোষগুলোর কার্যকলাপ পরিবর্তন করতে ব্যবহার করা যেতে পারে।

তথ্যসূত্র :

Getting bacteria and yeast to talk to each other, thanks to a 'nanotranslator' - American Chemical Society.